**প্রথম সংস্করণ** অগাস্ট ১৯৫৪ **প্রচ্ছদ ও অলংকরণ** নির্মলেন্দু মণ্ডল

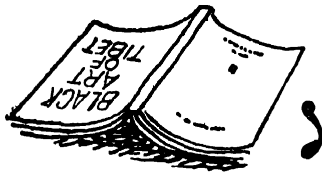
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫
বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ
প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ
বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

**মূল্য** ৮·০০

বুবু আর বুবুর আম্মাকে



আন্তর্জাতিক
শিশুবর্ষে
আনন্দ-উপহার




# ১

টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনে খুব বন্ধু। ওরা এক পাড়ায় থাকে, এক স্কুলে পড়ে। তিনজনেরই অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। টাবলু এবার ক্লাস টেনে উঠবে, জয় আর শংকর নাইনে। টাবলু এক ক্লাস উঁচুতে পড়ে বলে জয় আর শংকর ওকে টাবলুদা বলে ডাকে, কথা বলে অবশ্য তুই-তুই করে। টাবলুদাকে নিয়ে ওদের গর্বের শেষ নেই। টাবলু যেমনি লেখাপড়ায়, তেমনি খেলাধুলোয়। বরাবর পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়, ওদিকে আবার ইন্টার-স্কুল বক্সিংয়ে পরপর দুবছরের চ্যামপিয়ন। স্কুল বা পাড়ার ফুটবল, ক্রিকেট টিম ওকে ছাড়া তৈরি হয় না। আর যা ম্যাজিক দেখায় না টাবলু, বড়রা পর্যন্ত ওর ম্যাজিক দেখে হাঁ হয়ে যায়। বড়দের সঙ্গে বড়-বড় বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারে টাবলু। যেমন, দেশের বেকার সমস্যা, বিদেশে চিংড়ি মাছ আর ব্যাঙ রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আনা, ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক। এ-সব কথার মানে জয় আর শংকর ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু টাবলু যখন এই সব নিয়ে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তর্ক করে তখন অহংকারে ওদের বুক ফুলে ওঠে। ওদের মনে হয় টাবলুর কথাই ঠিক, টাবলুই শেষ পর্যন্ত তর্কে জিতে গেছে।

জয়েব মা আর শংকরের কাকীমা প্রায়ই ওদের বলেন, "দেখ তো, সব কিছুতেই টাবলু কেমন সেরা ছেলে আর তোরা! তোরা পারিস

না ওর মতো হতে ?” অন্য কারও সঙ্গে তুলনা টানলে জয় আর শংকর খুব চটে যেত, কিন্তু টাবলুর কথা আলাদা। টাবলু সব ব্যাপারেই ওদের চাইতে অনেক, অনেক ওপরে। ওরা সেটা ভালভাবে জানে, আর জানে বলেই টাবলুর প্রশংসায় ওরা খুব খুশি হয়ে ওঠে। টাবলুর মতো বন্ধু পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

টাবলুর গায়ে প্রচণ্ড জোর, বুকে দারুণ সাহস, আর মাথায় ভীষণ বুদ্ধি। এই তিনটে এক সঙ্গে খাটিয়ে টাবলু গত বছর এই সময় মধুপুরে একটা ডাকাত ধরেছিল। সঙ্গে অবশ্য জয় আর শংকর ছিল, তবে ওরা জানে ওদের আলাদা কোনো কৃতিত্ব নেই। কিন্তু টাবলু এত ভাল যে, সবাইকে ডেকে ডেকে বলে বেড়িয়েছিল, “একা কি আর ডাকাতটাকে ধরতে পারতাম, ভাগ্যিস সঙ্গে জয় আর শংকর ছিল।” গত বছর অ্যানুয়াল পরীক্ষা দিয়ে ওরা বাড়ির লোকদের সঙ্গে মধুপুর বেড়াতে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে পনেরো দিন ছিল ওরা। সেই দিনগুলোর কথা কেউ একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেনি। এবার পরীক্ষা হয়ে যাবার পরে মধুপুরের অ্যাডভেঞ্চারের কথা খুব বেশি করে মনে পড়ছিল ওদের। কিন্তু এবার তিন বাড়ির বড়দের কেউই কোথাও বেড়াতে যাবে না। বেড়াতে যাবার কথা বলতে-বলতে জয় আর শংকর কেঁদে ফেলেছে পর্যন্ত, কিন্তু বড়দের কাউকেই রাজী করাতে পারেনি, সবারই নাকি কী-সব দরকারি কাজ আছে।

টাবলু বলল, “বড়রা যাবে না তাতে কী হয়েছে, আমরা যাব।”

জয় চোখ বড়-বড় করে বলল, “একা-একা ?”

শুনে টাবলু হাসল। “তিনজনে গেলে কি আর একা-একা হয়।”

প্রায় তোত্‌লা হয়ে শংকর জিজ্ঞেস করল, “কোথায়, কোথায় যাব আমরা ?”

"নেপাল।"

"ন্যাপাল!"

"ন্যাপাল নয়, নেপাল।"

"সে তো অনেক দূর।"

"তা একটু দূর।"

"অদ্দূরে ছাড়বে আমাদের?"

"কেন ছাড়বে না, আমরা কি বড় হইনি?"

টাবলু বলল, "শোন্, বড়রা যে এবার আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাবে না, পরীক্ষা শুরু হবার আগেই আমি টের পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি নিজে-নিজেই একটা প্রোগ্রাম তৈরি করেছি। আমার ছোটমামা থাকেন নেপালে, তাঁর ওখানেই উঠব, একটা চিঠিও ছেড়ে দিয়েছি গত সপ্তাহে। নেপাল তো বিদেশ, সঙ্গে একটা পরিচয়পত্র থাকা ভাল। সতুদা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সতুদা বলেছেন, নিজের প্যাডে আমাদের জন্যে দু-চার লাইন লিখে দেবেন। লিখবেন, এরা ভারতীয় নাগরিক, শিক্ষামূলক ভ্রমণে নেপালে যাচ্ছে। নীচে সই, তার নীচে অফিসের স্ট্যাম্প, ব্যস, আর কী চাই।"

সব শুনে উত্তেজনায় জয় আর শংকরের গা-হাত-পা কেঁপে উঠল। টাবলুদা একা-একা এদ্দূর ভেবেছে, একা-একা এদ্দূর এগিয়েছে! কিন্তু, বাড়ির কথা ভেবেই ওদের মন খারাপ হয়ে গেল, বাড়ি থেকে কি ওদের ছাড়বে! কাছাকাছি হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু নেপাল—সে তো অনেক দূর। শংকর বলল, "আমাদের কথা কেউ শুনতেই চাইবে না, তোকে বাড়ির মত করাতে হবে।"

টাবলু একটু চটে উঠে বলল, "এর আবার মত করাবার কী আছে? তোদের বয়েসী ছেলেরা বিদেশে কী না করছে! একা-একা

নৌকো নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে, একা-একা অন্য দেশে বেড়াতে যাচ্ছে, দল বেঁধে পাহাড়ে উঠছে, আর তোরা সামান্য এখান থেকে ওখানে বেড়াতে যেতে পারবি না ?"

জয় আর শংকর দুজনেই বুঝতে পারল, টাবলু এই কথাগুলো সত্যি-সত্যি ওদের বলছে না। কথাগুলো টাবলু তৈরি করে রাখছে ওদের বাবা-মাদের বলার জন্যে। টাবলুর চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাস, এভাবে যদি বলতে পারে তাহলে বাবা-মারা হয়ত শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যাবেন।

টাবলু হাসতে হাসতে বলল, "সতুদা বলেছে, ওই চিঠিটায় আমাকে তোদের দুজনের অভিভাবক করে দেবে। অভিভাবক হিসেবে আমাকে কেমন মানাবে রে ?"

জয় আর শংকর একইসঙ্গে উত্তর দিল "টেরিফিক।" টেরিফিক শব্দটা কিছুদিন হল ওরা টাবলুর কাছ থেকেই শিখেছে। সত্যি, টাবলুকে অভিভাবক হিসেবে দারুণ মানাবে। টাবলু লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ছিপছিপে চেহারা বলে আরও লম্বা দেখায়। মুখে অল্প-অল্প দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। বয়সের তুলনায় বেশ একটু বড়ই মনে হয় টাবলুকে।

ওদের কথা হচ্ছিল টাবলুদের ছাতের ঘরে বসে। ঘরে কিংবা ছাতে আর কেউ নেই, কিন্তু টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "আমাদের তিনজনকে চারটে করে জিনিস অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। গতবার মধুপুরে এই জিনিসগুলো কাছে না থাকায় খুব অসুবিধেয় পড়তে হয়েছিল। জিনিসগুলো হল : এক—ছুরি, দুই—দড়ি, তিন—টর্চ, চার—টিনফুড। কেন, কিছু বুঝতে পারলি ?"

শংকর আর জয় কারণটা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল,



কিন্তু ওদের কৌতূহল এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, আন্দাজ খাটিয়ে সময় নষ্ট না করে তুদিকে মাথা নাড়িয়ে "না" বলে দিল।

টাবলু একটু কেসে গলা আরও নামিয়ে বলল, "ছুরি কিসে লাগে? আত্মরক্ষায় আর শত্রুকে আক্রমণ করতে। দড়ি লাগে শত্রুকে বাঁধতে কিংবা শত্রুদের দো তলা, তিনতলা থেকে দড়ি ঝুলিয়ে পালিয়ে যাবার কাজে। টর্চের দরকার বেয়াড়া জায়গায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে -পথ চলাতে। আর, টিনফুড? ধর, এমন জায়গায় গিয়ে পড়লাম যেখানে জনমনিষ্যি নেই। সেখান থেকে লোকালয়ে পৌঁছতে তু-তিনদিন লেগে যাবে। এই তু-তিনদিন খাব কী? না, টিনের খাবার।"

অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে জয় আর শংকরের গা শিরশির করে উঠল। শংকর আর বসে থাকতে পারল না, উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, "ব্যাপারটা একটু খুলে বল্ না টাবলুদা।"

টাবলু খুব রহস্যপূর্ণ হাসি হেসে বলল, "এখন না, পরে, দেখি।"

শংকর আর জয় তুজনেই জানে, টাবলুর এই "দেখি"-টা মারাত্মক। যতই জিজ্ঞেস করা যাক না কেন, টাবলু আর কিছু ভাঙবে না। "দেখি" মানে শুধু ওর নিজেরই দেখা, আর কাউকে কিচ্ছু না দেখানো।

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে জয় আর শংকরের তু-তিনদিন কেটে গেল। পরীক্ষা হয়ে গেছে, কোথায় মজা করে বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, তা না, ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে যায়। আর, ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় শুয়েও থাকতে পারে না। শরীরের মধ্যে অদ্ভুত ছটফটানি শুরু হয়ে যায়, মাথার মধ্যে আজগুবি সব চিন্তা ঘোরে। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। কিন্তু উঠেই বা কী করবে? হাতে কোনো কাজকম্ম

নেই। গল্পের বইয়ে মন বসে না, মন দিয়ে খেলাধুলোও করতে পারে না অনেকক্ষণ।

দুজনে দেখা হলেই শুধু ফিসফিস আর ফিসফিস। কী হবে, কেমন করে হবে, এই নিয়ে শুধু কথা। নেপালের রাস্তা-ঘাট পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে যা শুনেছে, কল্পনায় তার দশ গুণ বাড়িয়ে তোলে ওরা। অদৃশ্য শত্রুর চেহারা, চক্রান্ত নিয়েও ওদের ভাবনার শেষ নেই। ছুরি, দড়ি, টর্চ আর টিনফুডের কথা ওঠার পর থেকেই ওদের বারবার মনে হচ্ছে এবার সাঙ্ঘাতিক কিছু-একটা ঘটে যাবে।

জয় আজ দুদিন হল ভোরের দিকে খালি হাতে ব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারে যাবার আগে গায়ে একটু জোর বাড়িয়ে নেওয়া দরকার, না হলে শত্রুর বিরুদ্ধে ও লড়বে কী করে! অবশ্য ব্যায়াম করার কথা ও শংকর আর টাবলুকে বলেনি, বললেই ওরা খ্যাকখ্যাক করে হেসে উঠবে। রোগাপটকা বলে জয়ের মনে এমনিতেই একটু দুঃখ আছে, তাই নিয়ে কেউ হাসাহাসি করুক ও চায় না।

জয় আর শংকর দুজনেই বাড়ি থেকে ছুরি, দড়ি আর টর্চ যোগাড় করে লুকিয়ে রেখেছে। কাজ যতটা এগিয়ে রাখা যায় ততই ভাল। বাকি রইল শুধু টিনফুড। ওদের বাড়িতে টিনের কৌটোয় চাল, ডাল, ময়দা, সুজি, মশলাপাতি ইত্যাদি আছে, কিন্তু টিনে থাকলেই তো আর টিনফুড হয় না। টিনফুড কিনতে হবে। কিনতে হলে পয়সা দরকার, অত পয়সা ওদের কাছে এখন নেই। টাকাপয়সার অবশ্য অভাব হবে না যদি বাড়ি থেকে মত দেয়। কিন্তু মত দেবে কি। দুজনেই বলি-বলি করেও কিছু বলেনি বাড়িতে। ওরা বললে যদি ব্যাপারটা কেঁচে যায়, তার চাইতে টাবলুর বলা ভাল। কিন্তু

টাবলুর হলটা কী?

সেদিন নিজেই অত আগ্রহ করে ওদের সবকিছু বলল, তারপর থেকে একেবারে চেপে গেছে। বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা নিয়ে জয় আর শংকর হাজাররকম প্রশ্ন তোলে, কিন্তু টাবলু শুধু 'হুঁ-হাঁ' করে, অনেকসময় মনে হয় কথাগুলো ওর কানেই যাচ্ছে না। দিনরাত্তির ছাতের ঘরে বসে মচমচে হলুদ পাতার একটা ইংরেজি বই পড়ে। বইটার মলাট ছেঁড়া, পাতাগুলোর কোনা ভাঙা, আর অক্ষরগুলো কী খুদে-খুদে, বইটার কোথাও একটি ছবি পর্যন্ত নেই। এরকম বই দেখলেই রাগ হয়ে যায়। অথচ টাবলু যেন বইটার মধ্যে ডুবে আছে, মাঝেমধ্যে জায়গায়-জায়গায় লাল পেনসিল দিয়ে আণ্ডারলাইন করে। একটা পাতা পড়া হয়ে গেলে আর একটা পাতা এত যত্ন করে ওলটায় যেন একটু ধাক্কা লাগলেই ছাপানো অক্ষরগুলো বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে হুড়মুড় করে খসে পড়বে।

স্কুলের পড়ার বইয়ের বাইরে জয় আর শংকর একটাও ইংরেজি বই পড়ে না। পড়তে যে ওদের ইচ্ছে করে না তা নয়, তবে ইংরেজি বই দেখলেই ওদের কেন যেন স্কুলের বইয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আর, সেইজন্যেই পড়া হয়ে ওঠে না। অবিশ্যি ইংরেজি বইয়ের ছবি দেখতে ওদের খুব ভাল লাগে, খেলার বই হলে তো কথাই নেই। টাবলু গাদা-গাদা ইংরেজি গল্পের বই পড়ে, টাবলুর এই গুণটি নিয়েও ওদের খুব গর্ব, কিন্তু এখন ওই যাচ্ছেতাই বইটা না পড়লেই হত না! শংকর খুব বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কিসের বই ওটা, ডিটেকটিভ?"

টাবলু বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিল, "উহুঁ।"

"তবে কী? অ্যাডভেঞ্চার?"

"উহু ।"

"ভূতের ?"

"উহুঁ ।"

"খেলার ?"

"উহুঁ ।"

"তবে কিসের ?"

"উহুঁ ।"

টাবলুর রকমসকম দেখে জয়েরও খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওর উত্তর শুনে হাসি আর চেপে রাখতে পারল না, হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি শুনে টাবলু বিব্রত মুখে ওদের দিকে তাকাল, তারপর বলল, "ও হ্যাঁ, তোদের বলা হয়নি, আজকেই ছোটমামার চিঠি পেয়েছি। যাবার তারিখ জানাতে লিখেছে, বাস স্টপে আমাদের জন্যে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে।"

শুনে লাফিয়ে উঠল জয় আর শংকর। শংকর বলল, "তুই কী অদ্ভুত রে, এই কথাটাই এতক্ষণ বলিসনি আমাদের ?"

টাবলু আবার বইটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। ওদের উচ্ছ্বাস আর অত বড় দুটো লাফকে একেবারে গ্রাহ্যই করল না। চিঠিতে কী-কী লেখা আছে, তাই নিয়ে আর একটা কথাও বলল না। পরপর পাঁচ-সাতটা প্রশ্ন করল জয় আর শংকর, কিন্তু একটারও উত্তর দিল না টাবলু। রেগে গিয়ে জয় একটানে ওর হাত থেকে বইটা কেড়ে নিল। কেড়ে নিতেই টাবলু এমনভাবে হাঁ-হাঁ করে উঠল যেন জয় বই না নিয়ে ওর একখানা হাত খুলে নিয়েছে। বইটা পেছন দিকে লুকিয়ে জয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। ওর চোয়াল শক্ত, কিছুতেই বইটা দেবে না।

টাবলু অনুনয়ের গলায় বলল, "দিয়ে দে, দিয়ে দে, প্লিজ দিয়ে দে। অনেকদিনের পুরনো বই, নষ্ট হয়ে যাবে।"

শুনে জয় এমন ভাব দেখাল যেন কথাগুলোর ও মানেই বুঝতে পারেনি। পেছন থেকে শংকর ওকে উস্কে দিল, "কক্ষনো দিবি না, কী এক বই হয়েছে, তিনদিন ধরে কথা বলার সময় পর্যন্ত পাচ্ছে না। নেপাল যাবি না তো আমাদের নাচালি কেন অ্যাদ্দিন?"

"কে বলল, যাব না?" জয়ের হাত থেকে বইটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে উত্তর দিল টাবলু।

"কত যে যাবি বোঝা গেছে, যাবার ইচ্ছে থাকলে ছোটমামার চিঠি পাওয়ার কথা এত দেরিতে বলতিস না।"

"দেরি কোথায়!"

"দেরি না? সেই কখন এসেছি, আর এখন বাড়ি ফেরার সময় কথাটা বললি।"

"আরে বাবা! বললাম তো।"

"আসলে তোর বেড়াতে যাবার ইচ্ছে নেই।"

"কে বলল নেই?"

"ইচ্ছে থাকলে তুই এভাবে বই মুখে দিয়ে বসে থাকতিস না দিনরাত্তির।"

"তাই বলে আমি চুপ করে আছি নাকি। এই তো আজ সকালেই সতুদাকে ফোন করেছিলাম। নেপাল যাবার কাগজপত্র সব রেডি হয়ে গেছে, কাল গিয়ে নিয়ে আসব।"

ছোটমামার চিঠি এসেছে শুনে জয় আর শংকর আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল, কিন্তু এই কথাটা শুনে ওরা একেবারে পাথর হয়ে গেল। এত বড় একটা খবর, অথচ এ নিয়ে এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি

টাবলু! আর এখনই বা কীভাবে বলল! যেন বলতে চায়নি, নেহাত কথার পিঠে কথা চাপাতে গিয়ে খবরটা বেরিয়ে পড়েছে।

এত বড় একটা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে ওদের কয়েক মুহূর্ত লেগে গেল। সেই ফাঁকে টাবলু জয়ের আলগা মুঠো থেকে ওই বইটা বার করে নিল। টাবলুর মুখে রহস্যময় হাসি। বইয়ের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে বলল, "কাল দুপুরে তোরা বাড়ি থাকিস না, আমি গিয়ে মাসীমাদের মত করাব। হাতে ছোটমামার চিঠি আর সতুদার সার্টিফিকেট থাকলে ওঁরা অমত করতে পারবেন না! অ্যাদ্দিন বাড়িতে কিছু বলিনি কেন বুঝতে পেরেছিস? যা, পালা, রাত হয়ে গেছে, এ-কদিন বাড়িতে একটু বেশি করে গুড বয় হয়ে থাকতে হবে, বুঝলি। কাল বিকেলে আসিস।"

প্রচণ্ড উত্তেজনায় জয় আর শংকরের মুখ থেকে কোনো কথাই বেরুল না কিছুক্ষণ। শংকর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, "সত্যি টাবলুদা, কী যে বলব তোকে!"

জয় জ্বলজ্বলে চোখের মণি ফ্যাকাশে করে বলল, "সবই হবে, তবে বাড়ি থেকে কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে।"

টাবলু আবার বইয়ের মধ্যে তলিয়ে গেছে, ওই কথার উত্তরে ঠাণ্ডা গলায় শুধু বলল, "দেখি।"

বাড়ি ফিরে গেল জয় আর শংকর। দুজনের কেউই সে রাত্রে ভাল করে খেতে পারল না। খাবে কী করে? চাপা অস্বস্তি আর উত্তেজনা ওদের গলা আর বুকের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে।

জয় লুকিয়ে-লুকিয়ে বাবা-মায়ের মুখের দিকে তাকাল কয়েকবার। বোঝার চেষ্টা করল, বাবা-মা সত্যিই লোক কেমন! টাবলুদাকে যদি এক কথায় থামিয়ে দেয়। যদি বলে, "ন্-না, ওকে

একা-একা ছাড়ব না, যা বাঁদর একখানা !"

সে রাত্রে দুজনের কারোরই ঘুম এল না অনেকক্ষণ। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে এপাশ-ওপাশ করল মাঝরাত্তির পর্যন্ত। ঘুমোবার পরে আজেবাজে স্বপ্ন দেখল। ওদিকে আবার ঘুম ভেঙে গেল সাত-সকালে।

ঘুম থেকে উঠে জয় ব্যায়াম করতে গেল, কিন্তু ব্যায়ামে মন মন বসছিল না একটুও। রাতে ভাল ঘুম হয়নি, তাই গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করছিল ভীষণ। আর একটু সকাল হতেই শংকর এল ওদের বাড়িতে। আসতেই নিচু গলায় শলা-পরামর্শ শুরু হয়ে গেল। একই কথা, একই যুক্তি ঘুরেফিরে এল বেশ কয়েকবার, কিন্তু ওরা কিছুতেই বুঝতে পারছিল না বাড়িতে মত দেবে কি দেবে না !

জয়ের বাবা সকাল সাড়ে-আটটার সময় খবরের কাগজ পড়া বন্ধ করে দাড়ি কামাতে যান। আজ নটা বেজে গেল, অথচ উনি কাগজ ছেড়ে উঠলেন না। জয়ের তখন মনে পড়ে গেল যে, আজ রোববার। পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পরে কবে কী বার ওর সবসময় মনে থাকে না। আজ রোববার, তার মানে বাবা সন্ধে পর্যন্ত বাড়িতে থাকবেন। জয়ের বুক-কাঁপুনি নতুন করে শুরু হয়ে গেল। টাবলুদা বেড়াতে যাবার কথা মাকে বললেই মা বাবাকে দেখিয়ে দেবে, আর বাবা হয়ত এককথায় সব নাকচ করে দেবেন। শংকরের অবশ্য বাবার চাইতে মাকেই বেশি ভয়।

দুপুরবেলায় ওরা তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে ক্রিকেট ম্যাচ আছে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর সারাদিন এদিক-ওদিক টো-টো করে ঘুরে বিকেলবেলায় টাবলুর ছাতের ঘরে গিয়ে হাজির হল। টাবলু সেই বইটা পড়ছে, ওদের দিকে না তাকিয়ে

বলল, "বোস।"

ওরা না বসে টাবলুর পাশে এসে দাঁড়াল। শংকর গতকাল দেখে গিয়েছিল টাবলু একশ পঁচাশি পাতাটা পড়ছে। বইটা মোট দুশো কুড়ি পাতার, ভেবেছিল কাল রাতেই বইটা শেষ হয়ে যাবে। আজ এসে পৃষ্ঠাসংখ্যার দিকে তাকিয়ে ও অবাক হয়ে গেল, একশ নব্বুই। তার মানে চব্বিশ ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ পৃষ্ঠা পড়েছে! খুব রাগ হয়ে গেল শংকরের, আর রাগের কথা বলতেই টাবলুদা একটু হেসে বলল, "এই নিয়ে তিনবার আমি বইটা শেষ করছি, অদ্ভুত ইন্টারেস্টিং বই।"

ইন্টারেস্টিং বই নিয়ে একটুও মাথা ঘামাল না জয়, টাবলুর কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বলল, "গিয়েছিলি বাড়িতে? বলেছিস?"

টাবলু বইটা ভাঁজ করে রেখে গম্ভীর গলায় বলল, "গিয়েছিলাম।"

শুনেই জয় আর শংকরের ফর্সা মুখ লালচে হয়ে উঠল। "তারপর?"

"তারপর, সব বললাম?"

"কী বলল?"

"বলল, ছাড়বে না।"

"ছাড়বে না!"

"না, তবে···।"

"তবে?"

"আমি হাল ছাড়লাম না। সব বুঝিয়ে বললাম, ছোটমামার চিঠি আর সতুদার সার্টিফিকেট দেখালাম, তারপর···"

"তারপর?"

"তারপর অনেক কষ্টে রাজী করালাম।"

"রাজী? সত্যি রাজী?"

"হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ।"

শুনে জয় আর শংকর এমন নাচ জুড়ে দিল যে, দুপদাপ শব্দ শুনে টাবলুদের ঠাকুর ব্যাপার কী দেখার জন্যে ছাতে উঠে এল। ঠাকুরকে দেখে ওদের নাচ বেড়ে গেল আরও। পুরো পাঁচ মিনিট নাচার পরে ওরা দুজনেই জড়িয়ে ধরল টাবলুকে। সত্যি, টাবলুদার জবাব নেই! টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "ওক্বাল্ট সায়ান্স কাকে বলে জানিস?"

"কী সাইন্স?"

"বল তো ব্ল্যাক আর্ট কাকে বলে?"

"ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে—কালো···কালো···।"

"ন্‌না, কালোটালো না, ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে সত্যিকারের জাদু। এই যে বইটা দেখছিস না, একে বই না বলে সোনার খনি বলা উচিত।"

"ওহ্‌, বইটা ম্যাজিকের, নতুন ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছু শিখলি?"

টাবলু একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আমরা ম্যাজিকের বইতে তো শুধু হাতসাফাইয়ের কথা জানি, এ বইটা সে-সব নিয়ে নয়, এ হচ্ছে সত্যি-কারের জাদু। এই জাদু জানা থাকলে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়। ইচ্ছেমতো ঝড়-বৃষ্টি নামানো যায় আকাশ থেকে, সমুদ্র দুভাগ করে হেঁটে যাওয়া যায় ভেতর দিয়ে, আরও অদ্ভুত-অদ্ভুত ব্যাপার ঘটানো যায়।"

ঘটনাগুলো অবিশ্বাস্য, কিন্তু টাবলুর চোখ, মুখ আর বলার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে জয় আর শংকর কথাগুলো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারল না।

টাবলু বলল, "বইটা হচ্ছে ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট নিয়ে। এক সময় জাদুর চর্চায় তিব্বত সারা পৃথিবীর মাথার ওপরে ছিল, এখন

আর ততটা নেই, কিন্তু যা আছে তারও তুলনা মেলা ভার।"

শংকর দুম করে বলল, "চল না, আমরা তিব্বতে যাই।"

টাবলু দুদিকে মাথা নেড়ে বলল, "এখন আর সে উপায় নেই, তবে তিব্বতে যেতে না-পারলেও আমরা তিব্বতীদের কাছে যেতে পারি।"

"কী ভাবে?"

"ভারতের অনেক জায়গাতেই তিব্বতীরা ছড়িয়ে আছে। বুড়ো তিব্বতীদের কেউ-কেউ নিশ্চয় ওই সব জাদু জানে।"

জয় দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওই সব জাদুর দু-একটা যদি জানা যেত কী দারুণ হত বল্ তো!"

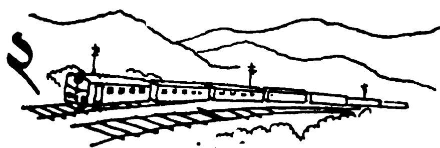
কয়েক মুহূর্ত কেউ আর কোনো কথা বলল না, সবাই বোধহয় চুপ করে অদ্ভুত সব জাদুর কথা ভাবল।

টাবলু বলল, "শোন, ট্রেনে রিজার্ভেশন পেয়ে গেলে পরশু দিন সন্ধেবেলাতেই আমরা রওনা হয়ে যাব। হাতে থাকল দেড় দিন, এই দেড়দিনের মধ্যে সব গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে হবে। অযথা একগাদা জিনিসপত্তর নিবি না, এমন লাগেজ নিবি যাতে হাতে ঝুলিয়ে কি পিঠে বেঁধে আমরা অনায়াসে ঘুরতে পারি।"

শংকর চকচকে মুখ করে বলল, "টাবলুদা, ছুরি, দড়ি আর টর্চ আমার যোগাড় হয়ে গেছে।"

"আমারও।" জয় গলা মেলাল।

ওরা ভেবেছিল কথাটা শুনে টাবলু খুব বাহবা দেবে, কিন্তু টাবলু একটাও কথা না বলে ওই বইটা টেনে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করে দিল।




মঙ্গলবারের বিকেল। এই দেড় দিন ওদের হাওয়ায় ভেসে কেটে গেল। ট্রেনের টিকিট, রিজার্ভেশন, কেনাকাটা, গোছানো সব হয়ে গেছে। সন্ধেয় ট্রেন। ওরা বাবা-মা আর বড়দের ঢিব-ঢিব করে প্রণাম করে, আর একবার সাবধানে থাকার উপদেশ শুনে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠল। ট্যাক্সি সাঁ করে ছুটে ওদের স্টেশনে নামিয়ে দিল। টাবলুর কাছে জয় আর শংকর কুড়িটা করে টাকা দিয়ে দিয়েছে। টাবলুর নিজেরটা নিয়ে এখন ষাট টাকার ফাণ্ড, ফুরিয়ে গেলে আবার ফাণ্ড তৈরি হবে। সব খরচখরচা এক হাতে হবে, অর্থাৎ টাবলুর হাত দিয়ে। টাবলু ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল।

ট্যাক্সি স্টেশনে থামতেই লাল-জামা-পরা দুটো কুলি ওদের ট্যাক্সির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু যখন দেখল ওদের কাছে তিনটে ব্যাগ ছাড়া আর কিছুই নেই তখন বেচারারা শুকনো মুখ করে ফিরে গেল। টাবলু বলল, "দেখলি তো, অল্প লাগেজ নিয়ে ঘোরার কী মজা, যখন যেখানে খুশি টকাটক চলে যাও, মালপত্র বইবার জন্য কারও ওপর নির্ভর করতে হবে না।"

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গিয়েছিল। বেশ ভিড় চারিদিকে। টাবলু বলল, "সাবধানে, হারিয়ে যাস না কেউ।" খুঁজে খুঁজে ওরা ওদের কম্পার্টমেন্টটা পেয়ে গেল। কম্পার্টমেন্টের গায়ে একটা টাইপ করা নামের লিস্ট ঝোলানো, এক গাদা লোক হুমড়ি খেয়ে সেগুলো

দেখছে। টাবলু একে-তাকে সরিয়ে ঠিক সামনে এগিয়ে গেল, ওর পেছন পেছন জয় আর শংকর। লিস্‌টে যাত্রীদের নামের পাশে বার্থ নম্বর লেখা আছে। ওই তো, ওই তো ওদের নাম—মিস্টার সুজয় মুখোপাধ্যায়, মিস্টার সুগত মিত্র আর মিস্টার শংকর সেন। টাবলুর ভাল নাম সুগত, জয়ের ভাল নাম সুজয় আর শংকরের ভাল নাম, ডাক নাম একই। নামের আগে মিস্টার লেখা দেখে ওদের তিন জনেরই কেমন গা শিরশির করে উঠল। মিস্টার! তার মানে ওরা বড়, আর পাঁচজন বড়দের মতো বড়।

বার্থ নম্বর দেখে নিয়ে ওরা কম্পার্টমেণ্টে উঠল। একটু এগোতেই ওরা পেয়ে গেল নম্বরগুলো, দুটো নীচের বেঞ্চি আর একটা ওপরের। ওপরের ঝুলন্ত বেঞ্চিটা দেখে জয় আর শংকর একই সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

"আমি ওপরেরটায় শোব।"

"না, ওটা আমার।"

ওদের ঝগড়া বেধে ওঠার মুখে টাবলু ধমক দিয়ে বলল, "কী, হচ্ছে কী! ছেলেমানুষি করছিস কেন?" "ছেলেমানুষি" শব্দটা মিস্টার সুজয় আর মিস্টার শংকরকে একেবারে চুপ করিয়ে দিল।

আসার সময় ওরা দেখেছে অন্যান্য কম্পার্টমেণ্টে কী ভিড়, কী ভিড়! কিন্তু এই কামরাটায় লোকজন খুব কম। আসলে এই কামরাটা শুয়ে যাবার যাত্রীদের জন্যে রিজার্ভ করা। মাথাপিছু একটা করে আস্ত বেঞ্চ। অনেকে এর মধ্যেই বিছানা পাততে শুরু করে দিয়েছে। টাবলুর হাতে ঘড়ি আছে, ওই ঘড়িতে সাতটা কুড়ি বাজতেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনটা নড়েচড়ে উঠল, তারপর চলতে শুরু করল আস্তে আস্তে। ট্রেন ছাড়তেই ওদের কামরার অনেক যাত্রী জানলার বাইরে



হাত গলিয়ে হাত নাড়তে শুরু করে দিল। যারা তুলে দিতে এসেছিল তারাও হাত নাড়তে লাগল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। জয় শংকরদের কেউ তুলে দিতে আসেনি, টাবলুই বারণ করেছিল সঙ্গে আসতে। কিন্তু ট্রেন ছাড়তেই প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে মায়ের মুখখানা দেখতে পেল জয়। মাকে ছাড়া ও কোনোদিন কোথাও যায়নি। হঠাৎ ওর কেমন যেন মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু ট্রেনটা যখন খুব জোরে ছুটতে শুরু করল তখন টাবলু আর শংকরের ঝলমলে মুখের দিকে তাকিয়ে ও বাড়ির কথা ভুলে গেল একদম।

শংকর জানলার ধারে বসে ছিল। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "যা দারুণ লাগছে না টাবলুদা, কী বলব তোকে! জয়, যা ওপরে উঠে শুয়ে পড়, আমি আজ রাত্তিরে আর শোবই না।"

জয় হেসে উঠল, "কে শোবে না, তুই? ঘুমের জন্যে রাত্তিরে তুই ভালভাবে খেতে পর্যন্ত পারিস না, তুই জেগে থাকবি সারা রাত্তির?"

ওর কথা শুনে টাবলু আর শংকর হেসে উঠল। শুধু মজার কথা নয়, যে-কোনো কথাতেই ওরা হেসে উঠছিল একসঙ্গে। ওরা এত খুশি বোধ হয় আর কখনও হয়নি। জীবনে এই প্রথম অভিভাবক ছাড়া ওরা বেড়াতে যাচ্ছে, তাও আবার ধারে-কাছে নয়, বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

কামরার এদিকে আরও তিনজন আছে। একজন ঝাঁকড়া গোঁফ-ওয়ালা, মোটা, গম্ভীর লোক। লোকটার হাতে টাইমটেবল, লোকটা ট্রেনে ওঠার পর থেকে টাইমটেবল পড়ছে, আর মাঝে-মধ্যে ওদের দিকে তাকাচ্ছে কটমট করে। সামনে বসে অকারণে এভাবে তাকালে কার না খারাপ লাগে! শংকর ফিসফিস করে বলল, "আমরা খুব হাসছি তো, সেইজন্যে লোকটা চটে গেছে।"

জয় বলল, "না রে, আমি তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে ওঠার সময় এই লোকটার পা মাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সেইজন্যেই বোধ হয় খেপে আছে।"

টাবলু লোকটাকে একবার খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, "কোনোটাই আসল কারণ নয়, আসলে লোকটার চাউনিটাই কটমটে, ওর ভাল লাগলেও কটমট করে তাকাবে।"

শংকর বলল, "তাহলে ওর নাম দেওয়া যাক মিস্টার কটমট।" তাই না শুনে জয় আর টাবলু হো-হো করে হেসে উঠল। হাসতেই মিস্টার কটমট ওদের দিকে তাকাল কটমট করে।

বাকি দু-জনের একজন বুড়ো ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের বাঁ হাত আর বাঁ পা প্লাস্টার করা। বয়েস হয়েছে তো, বোধ হয় পা পিছলে পড়ে গিয়ে ভেঙেছেন। সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা, মনে হয় ওঁর মেয়ে। ওদের সামনে ওদিকে জানলার কাছে ওপর-নীচে দুটো বেঞ্চি। দুই ভদ্রলোকই অবাঙালী। ওপরের জন পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। নীচের ভদ্রলোক একটা বিরাট টিফিন কেরিয়ার খুলে সীটের ওপর বাটিগুলো সাজাচ্ছেন। আস্তে আস্তে বাটি থেকে পুরি-তরকারি, বড় বড় লাড্ডু আর চাটনি বেরিয়ে এল। হাওয়ায় খাবারের গন্ধ ভেসে এসে ওদের তিন জনেরই নাকে লাগল। জয় বলল, "টাবলুদা, আমরাও তো এখন খেয়ে নিতে পারি।"

"তা পারি, ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলাই ভাল।" সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল টাবলু।

শংকর গম্ভীরভাবে বলল, "আমি শুনেছি, ট্রেনে উঠে বেশি রাত্তিরে নাকি খেতে নেই।"

ওরা বেঞ্চির ওপর একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে যে যার ব্যাগ



থেকে খাবার-দাবার বার করল। প্রত্যেকের বাড়ি থেকেই তিন জনের মতো খাবার দিয়ে দিয়েছে। কাগজের ওপর খাবারের পাহাড় হয়ে গেল। লুচি, আলুর দম, পরোটা-তরকারি, নিমকি, সন্দেশ, ক্ষীরের চপ আর কেক। মিস্টার কটমট একবার কটমট করে ওদের খাবারের দিকে তাকিয়ে আবার টাইমটেবল পড়তে শুরু করে দিল। ওদিকের লোকটা পুরি-তরকারি খেতে-খেতে ওদের খাবারের দিকে মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছিল জুলজুল করে।

তিন জনে যত খুশি খেয়েও সব খাবার শেষ করতে পারল না। টাবলু বাকি খাবারটা একটা পলিথিনের প্যাকেটে জড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে বলল, "এগুলো সকালে খাব আমরা। পথে একদম খাবার নষ্ট করা উচিত নয়।" তারপর হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে সামনের বুড়ো ভদ্রলোককে বলল, "দাদু, আপনি এই-ভাবে ওপরে উঠে শোবেন কী করে? নীচের দুটো বেঞ্চিই আমাদের, আপনি একটা নিন, আমাদের কেউ ওপরে চলে যাবে।"

শুনে ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, "বেশ বেশ।" টাবলু আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ভদ্রলোক আবার চোখ বুজে ঝিমোতে শুরু করে দিলেন। সঙ্গের ভদ্রমহিলা টাবলুকে একবার দেখে নিয়ে মুখ ঘোরালেন জানলার দিকে।

তাই দেখে জয় আর শংকরের একটু রাগ হয়ে গেল। টাবলু গায়ে পড়ে এত বড় একটা উপকার করল, ওদের তো আরও অনেক কিছু বলা উচিত ছিল। সে কথা টাবলুকে বলতেই টাবলু বলল, "না না, ওভাবে ব্যাপারটাকে দেখিস না। ভদ্রলোকের অত বড় একটা অ্যাকসিডেনট হয়েছে, নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছেন, এখন কি ওঁর গল্প করার মতো অবস্থা আছে।"

সব কটা জানলায় কাঁচের সার্সি ফেলা, কিন্তু মাঝে-মধ্যে কোথেকে যেন ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া আরও ঠাণ্ডা হয়ে উঠছিল। টাবলু, জয় আর শংকর—তিন জনের গায়েই পুরোহাতা সোয়েটার, ওরা শার্টের কলারগুলো তুলে কান ঢেকে গল্প করছিল। টাবলু হঠাৎ গলা নামিয়ে বলল, "তোদের আসল কথাটাই বলা হয়নি।" আসল কথা শোনার জন্যে জয় আর শংকর টাবলুর কাছাকাছি এগিয়ে এসে বসল।

টাবলু গলা আরও নামিয়ে বলল, "এখন না, সবাই শুয়ে পড়ুক, তারপরে বলব।" টাবলু আর কোনো কথা না বলে ব্যাগ খুলে কাগজের একটা প্যাকেট বার করল। প্যাকেট খুলতেই বেরিয়ে পড়ল মলাট ছেঁড়া, মচমচে পুরনো বইটা। এই বইটা দেখে দুদিন আগে জয় আর শংকরের কী রাগ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন বইটায় কী লেখা আছে জানার জন্যে ওদের খুব কৌতূহল হল। তবে এই কৌতূহলটা ছাপিয়ে আর একটা কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল—টাবলুদার আসল কথাটা কী?

একটু পরেই মিস্টার কটমট, বুড়ো ভদ্রলোক আর পুরি-খাওয়া লোকটার বড় বড় হাই উঠতে লাগল। তারপর এক এক করে সবাই শুয়ে পড়ল। বুড়ো ভদ্রলোক শুলেন ওদিকের নীচের বেঞ্চিটায়। টাবলু বইটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে সিলিংয়ের দুটো আলোর একটা নিবিয়ে দিল। টিমটিমে একটা আলোয় ঘরটা এখন আবছা অন্ধকার-অন্ধকার। জয় আর শংকর টাবলুর গা ঘেঁষে বসল। টাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, "আমরা কিন্তু এখন নেপাল যাচ্ছি না।"

শুনে শংকর আর জয় একইসঙ্গে আঁতকে উঠল, "সে কী!"

টাবলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "নেপাল যাব কয়েকদিন পরে।"

"তাহলে এখন কোথায় যাচ্ছি?" কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল জয়।

"যাচ্ছি রুটুংয়ে।"

"রুটুং! কোথায় সেটা?"

"নেপালের কাছেই। ছোট্ট একটা পাহাড়ী জায়গা, এর নাম বিশেষ কেউ জানে না।"

"হঠাৎ ওখানে যাচ্ছি কেন?"

"ওটাই তো আসল কথা। যাচ্ছি ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শিখতে।"

"রুটুং কি তিব্বতে?"

"না না, ভারতেই। তবে ওখানে প্রচুর তিব্বতী থাকে, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই ওইসব জাদু জানে।"

"জানলেই বা শেখাবে কেন?"

"আমরা শিষ্য হয়ে যাব। শিষ্যদের গুরুরা সব শেখায়। রামায়ণ, মহাভারতের গুরুরা শিষ্যদের কত ভালবাসতেন, পড়িসনি? অর্জুন, উতঙ্ক—এইসব শিষ্যদের দেখ। প্রিয় শিষ্য হতে পারলে গুরুরা অনেক সময় তাঁদের গুপ্ত বিদ্যাও দিয়ে দেন।"

"কিন্তু শিষ্য হতে গেলে তো অনেকদিন থাকতে হয়, আমরা অদ্দিন থাকব কী করে?"

"অদ্দিন থাকতে যাব কেন? তিন চারদিনের মধ্যে যা শেখা যায় তাই শিখব। ভেবে দেখ্, ওই সব জাদুর একটাও যদি শিখতে পারি, আমরা কী না করতে পারব।"

উত্তেজনায় জয় আর শংকরের কথা বন্ধ হয়ে গেল কিছুক্ষণ। কিন্তু, বাড়ির কথা মনে পড়তেই ভয় পেয়ে গেল দুজনেই। জয় বলল, "বাড়ি থেকে বারবার বলে দিয়েছে, নেপালে গিয়েই যেন পৌঁছসংবাদ জানিয়ে চিঠি দিই।"

"আমাকেও বলেছে।" শংকর বলল।

টাবলু কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠে উত্তর দিল, "আমাকে কি বলেনি? আমাকেও বলেছে। তবে, বাড়ির প্রত্যেকটা কথা শুনতে গেলে আর অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না। এই তো গতবার মধুপুরে—আমাদের কি বাড়ি থেকে ডাকাত ধরতে বলে দিয়েছিল? নেপালে তো যাচ্ছিই, একটু দেরি হবে এই যা, গিয়ে চারদিন আগের তারিখ বসিয়ে চিঠি ছেড়ে দেব। বাড়িতে ভাববে, পোস্টাফিসের গোলমালে চিঠি আসতে দেরি হয়েছে।"

টাবলুর এত চমৎকার সমাধানেও জয় আর শংকরের মন থেকে ভয় দূর হল না। শংকর হঠাৎ বলে উঠল, "টাবলুদা, তুই তো ছোট মামাকে যাবার তারিখ জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিস, ছোটমামা বাস স্টপে ওয়েট করবে—তার কী হবে!"

টাবলু গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না, অপেক্ষা করবে না।"

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে জয় আর শংকর ফ্যালফ্যাল করে টাবলুর মুখের দিকে তাকাল। জানলার সার্সির ফাঁক দিয়ে মাঝে-মধ্যে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল, কিন্তু ওরা তিনজনে এতই উত্তেজিত যে, কারোরই তেমন শীত লাগছিল না। টাবলু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "ছোটমামাকে আমি টেলিগ্রামই পাঠাইনি।"

"সে কী! তবে যে বললি…"

"এটুকু মিথ্যে না বললে বাড়ি থেকে আমাদের ছাড়তই না।"

"তাহলে নেপালে যখন যাব?"

"যাবার আগে রুটুং থেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব ছোটমামার কাছে।"

জয় আর শংকরের মুখ দিয়ে আর একটাও কথা বেরুলো না। ওরা দুজনেই বুঝতে পারল, সব কিছুর পেছনে টাবলুর একটা মস্ত প্ল্যান আছে। ওই মলাট-ছেঁড়া বইটা একটানা তিনবার পড়ার রহস্যও ওরা যেন ধরতে পারল।

টাবলু বলল, "নে শুয়ে পড়, অনেক রাত্তির হয়ে গেছে, ভোরবেলাতেই আমাদের আবার ট্রেন থেকে নামতে হবে। অ্যালার্ট থাকিস, ভোরে ঘুম না ভাঙলে কিন্তু কেলেঙ্কারি।"

কেউ আর একটাও কথা না বলে ব্যাগ থেকে বিছানাপত্তর বার করে, পেতে শুয়ে পড়ল। ট্রেনের দুলুনিতে তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যাওয়ার কথা, কিন্তু জয় আর শংকরের কিছুতেই ঘুম এল না। রাজ্যের উদ্ভট চিন্তা দুজনের মাথার মধ্যে। ভয়, আনন্দ আর উত্তেজনায় শীতের মধ্যেও ওদের গা-হাত-পা জ্বালা-জ্বালা করছিল। ঘুম এল মাঝ রাত্তিরে, তারপরে সে কী অঘোর ঘুম!

ভোরবেলায় টাবলুর ধাক্কাধাক্কিতেও ওদের ঘুম ভাঙতে চায় না কিছুতেই। ঘুমের ঘোরে জয় ভাবল, মা বোধহয় ওকে তুলে দিচ্ছে। বিড়বিড় করে বলল, "উঠছি, উঠছি, আর একটু পরে, পরীক্ষা তো হয়ে গেছে, এরকম করছ কেন?" বলতেই টাবলু হেসে উঠে টেনে এক চাঁটা কসাল ওর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসল জয়। তারপর দুজনে মিলে শংকরকে তুলে দিল। টাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "হাতে আর আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় আছে, চটপট

হাত মুখ ধুয়ে রেডি হয়ে নে।”

এই কামরাটায় দুটো বাথরুম আছে, ওরা খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুলেই জয় আর শংকরের ভীষণ খিদে পেয়ে যায়। সে কথা বলতেই টাবলু ব্যাগ থেকে পলিথিনে মোড়া খাবারগুলো বার করল। সবে ওরা খাবার মুখে দিয়েছে, এমন সময় মিস্টার কটমটের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতেই মিস্টার কটমট একবার ওদের দিকে আর একবার খাবারের দিকে তাকাল কটমট করে।

একটু পরেই ওই বুড়ো ভদ্রলোকের ঘুম ভাঙল। ভদ্রলোকের হাতে পায়ে প্লাস্টার, খুব কষ্ট করে উঠে বসলেন উনি, তারপর ওপরের বেঞ্চিতে শোয়া ওই ভদ্রমহিলাকে ডেকে দিলেন। ডাকতেই ভদ্রমহিলা ছোট্ট লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন নীচে।

সাড়ে-ছটা বেজে গেছে, অথচ বাইরেটা এখনও ফর্সা হয়নি। জানলার বাইরে শুধু কুয়াশা আর কুয়াশা। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেতে লাগল ওরা তিনজন। রাত্রের খাবারগুলোর স্বাদ সকালে যেন আরও বেড়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সব খাবার শেষ হয়ে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে বিছানাপত্তর ভাঁজ করে ওরা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। ঘন কুয়াশা এখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে। দূরের গাছপালা স্পষ্ট হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। ট্রেনের গতি একটু কমতেই টাবলু জানলার সার্সি তুলে মুখ বাড়াল বাইরের দিকে। একটু পরেই একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে ট্রেন থামল। স্টেশনের নামটা পড়ে নিয়ে টাবলু লাফিয়ে উঠল, “ওঠ, ওঠ, এখানেই নামতে হবে।”

যে যার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। ওদের পেছন-পেছন নামল হাতে-পায়ে প্লাস্টার লাগানো ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনটা ছেড়ে দিল, এত ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় না বেশিক্ষণ। ওরা ক'জন ছাড়া, অন্যান্য কামরা থেকে দু-তিনজন মোটে পাহাড়ী লোক নেমেছে। ট্রেনটা হুশ হুশ করে চলে যেতেই সারা প্লাটফর্ম খাঁ-খাঁ করে উঠল। ট্রেনের এই কটা যাত্রী ছাড়া আর কোথাও কাউকে চোখে পড়ল না ওদের। এমন কী গেটে টিকেট কালেক্টর পর্যন্ত নেই। টাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি পা চালা। শুনেছি এইসময় এখান থেকে একটা বাস ছাড়ে, ওটা মিস্ করলে খুব মুশকিলে পড়তে হবে।" বলেই টাবলু লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল। ওর চলার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে অল্প-অল্প ছুটতে হচ্ছিল জয় আর শংকরকে। গেট পেরিয়ে বাইরে আসতেই ওরা দেখে দূরে দাঁড়িয়ে একটা বাস হর্ন বাজাচ্ছে। "ওই বাসটাই হবে, ছোট্।"

ছুটতেই জয়ের মুখ-খোলা ব্যাগ থেকে একটা রংচংয়ে বাক্স লাফিয়ে মাটিতে পড়ে চতুর্দিকে একগাদা চকোলেট ছড়িয়ে দিল। চকোলেট ওদের তিনজনেরই খুব প্রিয়, এতগুলো চকোলেট ফেলে রেখে তো আর বাসে ওঠা যায় না। তিনজনেই উবু হয়ে বসে টপাটপ চকোলেট কুড়িয়ে বাক্সে ভরতে শুরু করে দিল। ওদের পাশ দিয়ে ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বাসের দিকে এগিয়ে গেলেন।

বেশ কয়েকটা চকোলেট ওদের বোধহয় কষ্ট বাড়াবার জন্যে ক্রিকেট মাঠের বাউণ্ডারি লাইনের মতো অনেক দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সব কুড়িয়ে তুলতে ওদের সময় গেল কিছুক্ষণ। হঠাৎ বাসের দিকে তাকিয়ে টাবলু চমকে উঠে বলল, "আরে!" সঙ্গে সঙ্গে

জয় আর শংকর তাকাল ওদিকে, কিন্তু ওরা অবাক হবার মতো কিছুই দেখতে পেল না। বাসটা যেমন ছিল তেমন আছে, বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা, আর কোথাও কিছু নেই। অথচ টাবলুর চোখেমুখে এখনও রীতিমত বিস্ময়। জয় আর শংকর উদ্‌গ্রীব হয়ে একই সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, "কী? কী? কী রে?"

টাবলু ওদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, "দৌড়ো।"

ব্যাগের মুখে হাত চাপা দিয়ে ওরা এক দৌড়ে বাসের কাছে পৌঁছে গেল। টাবলুই পৌঁছল সবার আগে। কনডাকটরকে কী যেন জিজ্ঞেস করে টাবলু বলল, "ওঠ, ওঠ, এটা রুটুং যাবে।"

ওরাই শেষ যাত্রী, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিল।

জানলার ধারে তিনজনে বসার মতো একটা সীট পেয়ে গেল ওরা। সীটে বসেই শংকর টাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই তখন অমন করলি কেন রে? কী দেখেছিস?" উত্তর শোনার জন্যে জয় মুখটাকে বাড়িয়ে দিল। টাবলু ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে আস্তে শব্দ করল—স্ স্ স্ স্ স্। তারপর ইঙ্গিতে সামনের সীটটা দেখিয়ে দিল। সামনের সীটে ওই বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা। টাবলু এমন কী বলবে যে, ওরা শুনে ফেললে অসুবিধে হবে? অনেক ভেবেও এই রহস্যের কিনারা করতে পারল না জয় আর শংকর। ওরা অনেক কষ্টে কৌতূহল চেপে বাসের ভেতরটা দেখে নিল।

বাসে ওরা তিনজন আর সামনের দুজন ছাড়া আর একটিও বাঙালী যাত্রী নেই। বাকি সবাই পাহাড়ী লোক। বাস সোজা বেশ কিছুটা ছুটে এসে ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁক নিল, একটু গিয়ে আবার বাঁক, আর একটু গিয়ে আবার বাঁক। টাবলু বলল, "বাস পাহাড়ে

উঠছে।" শুনেই জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাইরে তাকাল জয় আর শংকর। ওরা জীবনে এই প্রথম পাহাড়ে উঠছে। টাবলু অবশ্য এর আগে উঠেছে তিনবার।

বাঁক ঘুরে ঘুরে বাসটা যত ওপরে উঠছে রাস্তার ধারের খাদ গভীর হয়ে উঠছে তত। বাসটা মাঝে-মধ্যে রাস্তার এত ধার দিয়ে যাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি উল্টে গেল। এ-সব ভেবে গা শিরশির করে উঠছিল জয় আর শংকরের। জয় ব্যাগ খুলে চকোলেটের বাক্সটা বার করল, তারপর তিনজনে তিনটে চকোলেট মুখে ফেলে আবার বাইরের দিকে তাকাল। চড়া রোদ্দুর উঠে গেছে, অথচ হাওয়ায় বেশ শীত ভাব। টাবলু বলল, "এ আর কী এমন শীত, পাহাড়ের যত ওপরে উঠবি, শীত তত বাড়বে।"

জয় গম্ভীরভাবে বলল, "তা কিন্তু হওয়া উচিত নয়। পাহাড়ের ওপরে ওঠা মানে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া, আর সূর্যের কাছাকাছি গেলে তো শীতের বদলে বেশি গরম লাগার কথা।" শুনে টাবলু আর শংকর হো-হো করে হেসে উঠল।

অসভ্যের মতো হাসতে দেখে জয় একটু চটে গিয়ে বলল, "বোকার মতো হাসিস না, যুক্তি দিয়ে বোঝা তো।" তেমন যুক্তি দেখাতে না পেরে শংকর আর টাবলু আরও জোরে হেসে উঠল।

আর ঠিক তক্ষুনি কাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল বাসটা। ড্রাইভারের পাশের কাচের জানলা দিয়ে ওরা দেখল, একটা সাদা-কালো রং করা মস্ত খুঁটি আড়াআড়ি করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে রাস্তার ওপর। খুঁটির পাশে খাকি রংয়ের জামা আর হাফ প্যান্ট পরা তিন-চারটে লোক।

বাসটা বেশ জোরেই ব্রেক কষেছে, আর তাতেই বোধহয়

সামনের ওই বুড়ো ভদ্রলোকের ভাঙা হাতে-পায়ে চোট লেগে গিয়েছে। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগলেন। ভদ্রলোককে ছটফট করতে দেখে জয়ের খুব কষ্ট হল। বাজে ড্রাইভার, এত জোরে কেউ ব্রেক কষে! কিন্তু, এ জন্যে বাসের অন্যান্য যাত্রীদের কেউ কিচ্ছু বলল না ড্রাইভারকে। কেউ কিছু বললে জয়ও ড্রাইভারকে দু-কথা শুনিয়ে দিত, কিন্তু সবাই চুপ করে আছে দেখে একা-একা মুখ খুলতে সাহস হল না ওর। ওই ভদ্রমহিলা হাত-ব্যাগ খুলে ওষুধ খাইয়ে দিলেন বুড়ো ভদ্রলোককে। ওষুধ খেয়েও ভদ্রলোকের যন্ত্রণা কমল না, সমানে ছটফট করতে লাগলেন উনি।

একটু পরেই ওই খাকি জামাপ্যান্ট পরা লোকগুলো উঠে এল বাসের মধ্যে। এসেই কাউকে কিচ্ছু না বলে এর-তার ব্যাগ, স্যুটকেস খুলে কী যেন খুঁজতে শুরু করে দিল। সীটগুলোর নীচেও উঁকি মেরে দেখল। তবে জয়, শংকর আর টাবলুর ব্যাগে কেউ হাত দিল না। একজন শুধু সামনে এসে ওদের মুখের দিকে তাকিয়েই চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ওই লোকগুলো নেমে গেল বাস থেকে। নামবার একটু পরেই রাস্তার ওই লম্বা সাদা-কালো খুঁটিটা সরিয়ে নেওয়া হল। দুবার হর্ন বাজিয়ে বাসটা ছুটতে লাগল আবার। শংকর জিজ্ঞেস করল, "টাবলুদা, ওই খাকি জামাপরা লোকগুলো কারা?"

"কাস্টমসের লোক, এ-রাস্তা দিয়ে নিশ্চয়ই চোরাই চালান-টালান হয়," উত্তর দিল টাবলু।

জয় বড়-বড় চোখ করে বলল, "চোরাই চালান, তার মানে স্মাগলিং, কী স্মাগল হয় রে?"

টাবলু ওর কথার কোনো উত্তর দিল না। টাবলুর দাঁতে দাঁত, চোয়ালটা একটু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, আর কপালে অনেকগুলো

ভাঁজ। খুব জটিল কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে টাবলুর মুখটা এইরকম হয়ে যায়। জয় আর শংকর দুজনেই খুব ভালভাবে জানে যে, টাবলু এখন আর একটা কথাও বলবে না।

সোজা রাস্তা এখন আর ধরতে গেলে একদম নেই। বাসটা খালি ঘুরছে, ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। এত ঘুরলে মাথা ঝিমঝিম করে, ঘুম পায়। জয় আর শংকর বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে কে জানে, হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। বাসটা দাঁড়িয়ে আছে। টাবলু বলল, "নাম।"

"এসে গেছে রুটুং?"

"উঁহু, খাবি না?"

অধিকাংশ যাত্রীই নেমে গেছে বাস থেকে। ওরাও নেমে পড়ল। এখানে রাস্তাটা একটু চওড়া, বাসটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় ঘেঁষে। ওদিকে একটা ছোট্ট টিনের চালাঘর, তার সামনে বাসের যাত্রীদের ভিড়। এই চালাঘরটাই বোধ হয় এই এলাকার একমাত্র হোটেল, একমাত্র রেস্টুরেন্ট, একমাত্র সবজির দোকান আর একমাত্র মুদিখানা। আর কোথাও কোনো দোকান নেই। একটা থুত্থুড়ে বুড়ো লোক, আর পিঠে বাচ্চা-বাঁধা মাঝবয়েসী একটা বউ খদ্দের সামলাচ্ছে।

টাবলু দোকানে ঢুকে ছটা সেদ্ধ ডিম কিনে নিয়ে এসে বলল, "আমাদের খাবার মতো এখানে আর কিচ্ছু নেই।" ডিমগুলো শংকরের হাতে ধরিয়ে টাবলু এক ছুটে বাসে উঠে গেল, একটু পরেই ফিরে এল এক হাতে একটা পাউরুটি আর এক হাতে জ্যামের শিশি নিয়ে।

দোকানে চেয়ার-টেবিল বা বেঞ্চির পাট নেই, ওরা একটু দূরে



গিয়ে একটা সাদা পাথরের টুকরোর ওপর বসল। চারদিকটা উঁচু-উঁচু পাহাড় দিয়ে ঘেরা, কী দারুণ লাগছিল দেখতে। চারদিক দেখতে দেখতে ওরা ডিম সেদ্ধ, পাউরুটি আর জ্যাম খেল। ওদের ধারে কাছে আর কেউ নেই। টাবলু হঠাৎ গম্ভীর মুখে বলল, "ওই বুড়োটা ডেন্‌জারাস।"

"কোন বুড়োটা?"

"ওই যে হাত-পা প্লাস্টার-করা বুড়োটা।"

"কেন? কেন?"

"বাসে ওঠার মুখে যখন আমাদের চকোলেট পড়ে গেল, তখন দেখলাম···।"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, কী দেখেছিলি রে?"

"বাসে ওঠার রাস্তায় একটা ভাঙাচোরা বাড়ি আছে না?"

"হ্যাঁ-হ্যাঁ।"

"ওর পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটা প্লাস্টার-করা পা নিয়ে বেশ কিছুটা জোরে দৌড়ে গেল।"

"সে কী!"

"হ্যাঁরে, নিজের চোখে দেখা। অথচ পাঁচজনের সামনে লোকটা ভদ্রমহিলার কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।"

শুনে শংকরের চোখ বড়-বড় আর মুখ সামান্য হাঁ হয়ে গেল। ওরা একটা কথাও বলতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে টাবলু বলল, "কাস্টমসের লোকগুলো যখন বাসে চেকিং করতে এল, তখন আমি বুঝতে পারলাম, লোকটা আসলে কী!"

"কী? কী?"

"কী বুঝতে পারলি না?"

"না তো।"

"আচ্ছা, চেকিংয়ের সময় ছাড়া সারা রাস্তায় লোকটাকে একবারও উঃ-আঃ করতে দেখেছিস?"

"না, না তো।"

"ওর যত কষ্ট শুধু চেকিংয়ের সময়ই বেড়ে উঠল, আবার বাস ছাড়তেই সব কষ্ট সেরে গেল।"

সমস্ত ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে দেখতেই জয় আর শংকরের গা ছমছম করে উঠল। টাবলু মুখ কঠিন করে বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা স্মাগলার।"

"স্মাগলার!"

ড্রাইভার হঠাৎ হর্ন বাজাতে শুরু করে দিল, বাস বোধ হয় ছাড়বে এবার, অনেকেই এর মধ্যে উঠে পড়েছে বাসে। ওরাও ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল। সব যাত্রী তুলে নিয়ে বাসটা ছুটতে শুরু করল আবার।

সীটে বসেই উশখুশ করতে লাগল জয় আর শংকর। ওদের সামনের সীটেই বসে আছে স্মাগলারটা, পেছন থেকে মুখ দেখার উপায় নেই, অথচ ওদের দুজনেরই এই মুহূর্তে বুড়োটার মুখ দেখার ইচ্ছে করছিল ভীষণ। ওদের এপাশ-ওপাশ করতে দেখে টাবলু চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলল, "ওরকম করিস না, সন্দেহ করবে।"

বাস আর-একটু ওপরে উঠতেই রোদ্দুর আর মেঘের খেলা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। এই রোদ্দুর, এই মেঘ—এই মেঘ এই রোদ্দুর। আগের তুলনায় শীত বেড়ে গেছে বেশ। ঠাণ্ডা হাওয়া পুরোহাতা সোয়েটার, গরম জামা গেঞ্জি ভেদ করে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল সারা গায়ে। আর একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু হয়ে গেল এই মাত্তর, ওদের

কানে মাঝে-মধ্যে কেমন যেন তালা লেগে যাচ্ছিল। টাবলু বলল, "বেশি শীতে এরকম হয়।"

বিকেল নাগাদ ঝমঝম করে একটা পাহাড়ী নদীর সেতু পেরিয়ে বাস এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট লোকালয়ে। কণ্ডাকটর চেঁচিয়ে বলল, "রুটুং, রুটুং।"

এই সেই রুটুং, ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শেখার জায়গা। ওরা জানলা দিয়ে এমনভাবে বাইরে তাকাল, যেন এক্ষুনি আশ্চর্যজনক কিছু ওদের চোখে পড়বে। কিন্তু, তেমন কিছুই চোখে পড়ল না, সব কিছুই অত্যন্ত সাধারণ।

ওরা কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে, আর তারপরেই চমকে গিয়ে দেখল ওই বুড়ো স্মাগলারটা আর ভদ্রমহিলাও নেমে এসেছে বাস থেকে। ওদের নামিয়ে দিয়ে বাস ছেড়ে দিল আবার।

ভদ্রমহিলার কাঁধে হাত দিয়ে বুড়োটা হেঁটে যাচ্ছে ওই দিকে। জয় আর শংকর অবাক হয়ে দেখল, বুড়োটা দিব্যি হাঁটছে। একটু খোঁড়াচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এত জোরে লোকটাকে হাঁটতে দেখেনি আগে। বাস রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে লোকটা ঢালু রাস্তা ধরল। রাস্তাটা বেশ ঢালু, একটু পরেই ওদের আর দেখা গেল না। টাবলু বলল, "চল্ তো দেখি কোথায় যাচ্ছে।"

শংকর ছুটতে যাচ্ছিল, টাবলু বারণ করল, "ছুটিস না, বুঝে ফেলবে।"

রাস্তার ধারে গিয়ে ওরা কাউকে দেখতে পেল না। পাহাড়ী রাস্তা সোজা কিছুটা নেমে গিয়ে বাঁদিকে বেঁকে গেছে। ওরা বাঁকের মুখ পর্যন্ত নেমে গিয়েও কাউকে দেখতে পেল না। জোরে জোরে পা ফেলে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। অবাক কাণ্ড। কেউ কোথাও



নেই। আর কিছুটা যাবার পরে দেখে পথটা দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। জয় আর শংকর বাঁদিকের পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল। টাবলু নিষেধ করল, "এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে না, ধরা পড়ে যেতে পারি। জায়গাটা খুব ছোট্ট, কাল ঠিক খুঁজে বার করব বুড়োটাকে। এখন চল হোটেলের খোঁজ করি, অন্ধকার হয়ে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে, অচেনা জায়গা।"

পথটা বেশ ঢালু, ওরা এর মধ্যে যে এতটা নেমে এসেছে বুঝতে পারেনি। খাড়াই পথ বেয়ে ওপরে উঠতে গিয়ে এত শীতের মধ্যেও ওদের ঘাম ছুটে গেল প্রায়।

বাস-রাস্তাটা ধরতে গেলে একদম ফাঁকা, দু-চারটে লোক এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে আছে। সবাই পাহাড়ী লোক। একজনের কাছে গিয়ে শংকর জিজ্ঞেস করল, "এখানে থাকার হোটেল কোথায় আছে বলতে পারেন?"

শুনে লোকটা এমন ভাবে তাকাল যে, পরিষ্কার বোঝা গেল ও শংকরের কথার একটা বর্ণও বুঝতে পারেনি।

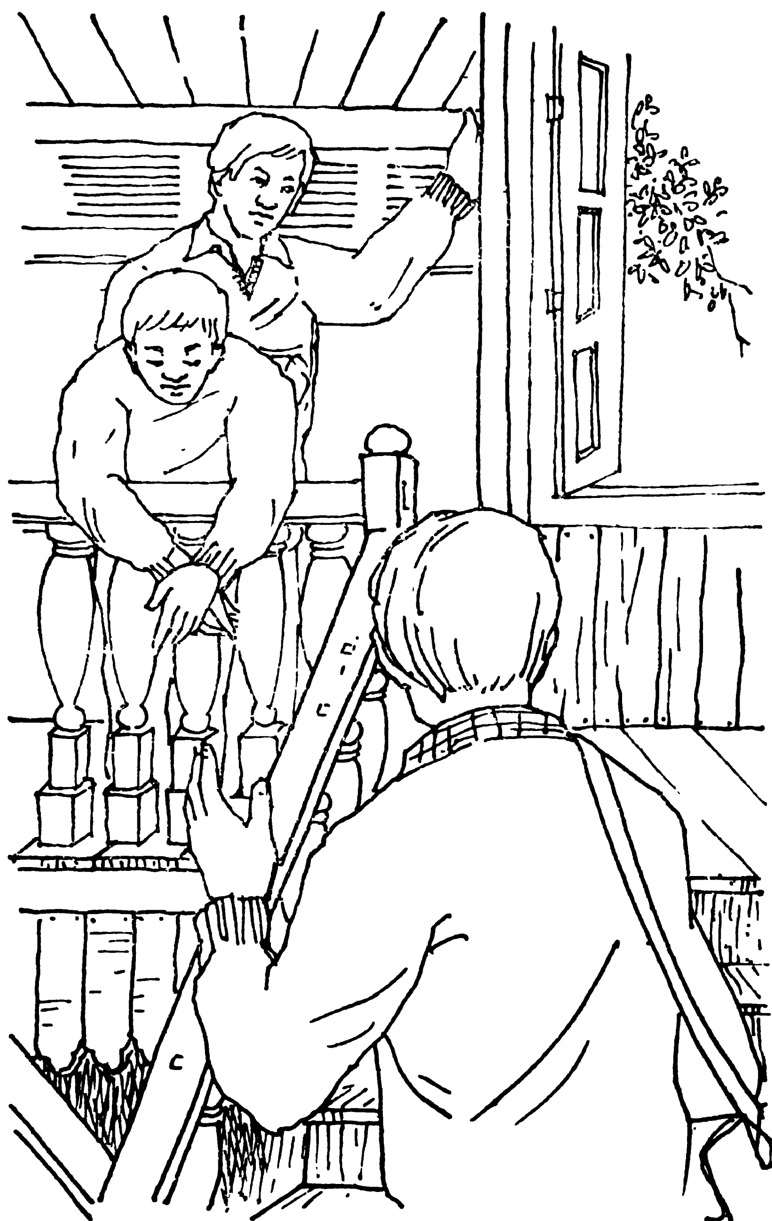
টাবলু তখন বলল, "ইহা রহনে কা কোঈ হোটেল-উটেল হ্যায়?"

লোকটা হিন্দীও বুঝতে পারল না।

জয় টক করে বলল, "এনি হোটেল হিয়ার?"

লোকটা এবার হেসে উঠে দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলতে শুরু করে দিল।

দেখতে দেখতে ওদের চারদিক ঘিরে পাহাড়ী লোকদের একটা ছোটখাট ভিড় হয়ে গেল। টাবলু, জয় আর শংকর পালা করে তিন ভাষাতেই ওদের প্রশ্নগুলো করে যেতে লাগল। প্রশ্নগুলো শুনে দুর্বোধ ভাষায় তর্ক বেধে গেল ওদের মধ্যে। এমন সময় মোটামুটি



ভাল জামাকাপড় পরা একটা পাহাড়ী লোক এসে বলল, "ওটেল? আও মেরে সাথ।"

লোকটা ওদের অনেকটা হাঁটিয়ে নিয়ে একটা দোতলা কাঠের বাড়িতে ঢোকাল। ঢুকতেই টুকটুকে লাল গাল একগাদা বাচ্চা-কাচ্চা আর খুব লোমওলা তিনটে বেঁটে কুকুর ওদের ঘিরে দাঁড়াল। একটু পরেই মাঝবয়েসী দুটো মেয়ে আর একটা লোক এল। এদেরই বাড়ি, এই বাড়িতেই এরা নিজেদের সংসার আর হোটেল চালায়। এরা কাজ চালাবার মতো হিন্দী জানে, বাংলাও জানে অল্প-অল্প।

থাকা-খাওয়ার জন্যে মাথাপিছু পাঁচ টাকা, অর্থাৎ দিনে পনেরো টাকা লাগবে তিনজনের। দোতলার কোণের ঘরটা পেয়ে গেল ওরা। দুটো খাট জোড়া দেওয়া, বিছানা, বালিশ আর ভারী কম্বল আছে। টাবলু বলল, "এত শস্তায় এত ভাল বন্দোবস্ত, ভাবা যায় না। আসলে এখানে টুরিস্ট বিশেষ আসে না, বুঝলি।"

সন্ধে হতেই জাঁকিয়ে শীত পড়ল। ঘরের জানলা বন্ধ করে কম্বল মুড়ি দিয়ে, হ্যারিকেনের আলোয় ওরা গল্প করল কিছুক্ষণ। তারপর নীচে গিয়ে গরম-গরম ভাত, আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর ডাল খেয়ে এল খুব তৃপ্তি করে। খেয়েদেয়ে প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গেল জয় আর শংকরের, ওরা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। টাবলু কিন্তু তক্ষুনি শুল না, নোট বই বার করে হ্যারিকেনের সামনে বসে খুব ভেবে-ভেবে কী-সব যেন নোট করতে শুরু করে দিল। গতবার মধুপুরে ডাকাত ধরার আগেও টাবলু ঠিক এইভাবে শোবার আগে সাংকেতিক ভাষায় নোট বইতে অনেক কিছু লিখত।



৩

সবার আগে ঘুম ভাঙল শংকরের। কাচের জানলা দিয়ে ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে, ও শুয়ে শুয়েই দূরের একটা নীল পাহাড়ের মাথা দেখতে পেল। ধপধপে সাদা মেঘের টুকরো পাহাড়ের মাথা ছুঁয়ে ভাসছে। এমন দৃশ্য ও কোনোদিন দেখেনি। লাফিয়ে উঠে দুই টানে জয় আর টাবলুর কম্বল সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "দেখ দেখ।" ওর চিৎকারে তড়াক করে উঠে বসল দুজনে। উঠে বসেই জয় রেগে গেল, তারপর বিড়বিড় করে শংকরকে কী-সব বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল আবার। টাবলু আর শুল না, একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে কাচের জানলাটা খুলে দিল। খুলতেই হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে এল ঘরের মধ্যে। টাবলু জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলল, "বাঃ ব্রাইট ওয়েদার, চ আমরা চটপট বেরিয়ে পড়ি, জয়কে তোল।"

কিন্তু, এখন জয়কে তুলতে গেলেই ও নির্ঘাত হাত-পা ছুঁড়বে, ভীষণ ঘুমকাতুরে জয়। শংকর এবার একটু ভেবেচিন্তে এগোল। প্রথমেই ও নিজের আর টাবলুর কম্বল দুটো লুকিয়ে ফেলল আলমারিটার মধ্যে, তারপর ঘরের দরজা খুলে রেখে টান মেরে জয়ের কম্বলটা তুলে নিয়ে এক দৌড়ে নীচে পালিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওর কানে এল জয়ের প্রচণ্ড চিৎকার আর টাবলুর গলাফাটানো হাসি। চিৎকার থামার বেশ কিছুক্ষণ পরে ও আস্তে-

আস্তে উঠে এল ওপরে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা হাতমুখ ধুয়ে, জেলি মাখিয়ে পাউরুটি খেয়ে, বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। চারদিক কী সুন্দর দেখতে, তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের আর আশ মিটছিল না। জায়গাটা যে এত চমৎকার, কাল সন্ধেবেলায় ওদের একবারও মনে হয়নি। টাবলু সঙ্গে ক্যামেরা নিয়ে এসেছে, ক্লিক ক্লিক করে একটা পাহাড়ের আর একটা ঢালু রাস্তার ছবি তুলে নিল। জয় বলল, "টাবলুদা, আমাদের ছবি তুলবি না?"

"তুলব।"

"তোলার সময় তোর ঘড়িটা আমি পরব।"

টাবলু উত্তর দেবার আগেই শংকর হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "য়্যোঃ, যা না সরু-সরু হাত, তুই কি ঘড়ি পরবি, পরব আমি।" শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে জয়ের খুব রাগ হয়ে যায়, তার ওপর আজ সকালেই আবার শংকরটা ওর কম্বল কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। শোধ তোলার জন্যে জয় তাড়া করল শংকরকে। শংকর ছুটতে লাগল, শংকরের পেছন জয়, ওর পেছনে টাবলু। ছুটতে-ছুটতে ওরা তিন রাস্তার মাথায় এসে পৌঁছল। মোড়ে একটা পুলিশ দাঁড়িয়ে, পুলিশের সামনে দৌড়তে নেই, ওরা তাই দৌড় থামিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে-দেখতে টুরিস্টদের মতো হাঁটতে লাগল।

এটাই বোধ হয় রুটুংয়ের সবচাইতে ব্যস্ত জায়গা। পরপর পাঁচ-সাতটা দোকান, দুটো ছোট অফিসবাড়ি আর একটা ছোট পোস্টাফিস। পোস্টাফিস দেখে টাবলু বলল, "আমরা এখান থেকেই ছোটমামাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেব।"

আরও কিছুটা এগোবার পরে ডানদিকে একটা সরু রাস্তা চোখে

পড়ল। রাস্তার দুদিকে বসে অনেকগুলো মেয়ে সবজি আর ডিম বিক্রি করছে, কেনাকাটাও করছে মেয়েরা। টাবলু বলল, "এখানে মেয়েরাই সব, ছেলেরা খুব কম কাজ করে।"

শংকর টিপ্পুনি কাটল, "জয়, তুই তাহলে এখানে থেকে যা, খালি খাবি আর ঘুমোবি।"

জয় কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টাবলু চাপা গলায় বলে উঠল, "চুপ! চুপ! লোকটাকে দেখ।"

লোকটা ওদের সামান্য আগে-আগে হাঁটছিল। একেবারে বুড়ো লোক, হাঁটু থেকে মাথা পর্যন্ত রঙিন আলখাল্লা জড়ানো। গলায় লাল-নীল পাথর, শেকড় আর কড়ির মালা। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে কয়েকবার তাকাল, তবে ওদের দিকে নয়, আরও পেছনে। পাহাড়ী, মুখে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ি, গায়ের রং হলুদ।

টাবলু প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় বলল, "লোকটাকে আমার তিব্বতী বলে মনে হচ্ছে, এ নিশ্চয়ই ব্ল্যাক আর্ট জানে।"

শুনে জয় আর শংকরের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। টাবলু আরও নিচু গলায় বলল, "লোকটাকে ফলো করতে হবে।"

বুড়ো লোকটা খুব আস্তে-আস্তে হাঁটছিল, এত আস্তে যে টাবলুরা যতই আস্তে হাঁটুক না কেন ঠিক ওকে পেরিয়ে যাবে। টাবলু হঠাৎ বসে পড়ে ফস করে টান মেরে জুতোর ফিতে খুলে ফেলে সময় নিয়ে বাঁধতে লাগল। কেউ দেখলে ভাববে, জুতোর ফিতে খুলে গেছে তাই বাঁধছে। টাবলুর বুদ্ধির তারিফ করল জয় আর শংকর ফিস-ফিস করে।

আবার কিছুটা হেঁটে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার ভঙ্গি করে সময় কাটাল কিছুক্ষণ টাবলু। বুড়ো লোকটা আস্তে আস্তে হাঁটছে,

হাঁটছে তো হাঁটছেই, থামার আর নাম নেই।

এই লোকটা সেই সব জাদু জানে, যা জানলে আস্ত একটা পাহাড় উড়িয়ে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায়, ইচ্ছেমতো ঝড়বৃষ্টি নামানো যায় আকাশ থেকে, সমুদ্র দু' ভাগ করে হেঁটে যাওয়া যায় ভেতর দিয়ে। টাবলুর এই কথাগুলো জয় আর শংকরের মাথার মধ্যে ঘুরছিল সমানে। সেই জাদুকরকে পাওয়া গেছে, এখন যদি উনি দয়া করে দু-একটা জাদু ওদের শিখিয়ে দেন! এই সব ভাবতে ভাবতে জয় আর শংকরের গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠছিল।

কিন্তু যদি অন্যরকম হয়! জয়ের হঠাৎ আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়ে গেল। জাদুকর যদি চটে গিয়ে ওদের কালো কুকুর কিংবা ভেড়া বানিয়ে দেন! ফিসফিস করে সে-কথা বলতেই টাবলু অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে।

হাঁটতে-হাঁটতে দোকানপাট, বাজার অনেক পেছনে পড়ে গেল। আশেপাশে লোকজন, বাড়িঘর কিচ্ছু নেই। মোড় ঘুরতেই একটা কুঁড়েঘর চোখে পড়ল, জাদুকর সেদিকেই এগিয়ে চলেছেন, ওটাই বোধ হয় ওঁর সাধনার জায়গা।

কুঁড়েঘরে ঢোকার মুখে টাবলু ছুটে গিয়ে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। পায়ে হাত দিতেই জাদুকর অবাক হয়ে টাবলুর দিকে তাকালেন। সেই ফাঁকে জয় আর শংকরও প্রণাম সেরে নিল।

টাবলু বলল, "আমরা অনেক দূর থেকে আপনার কাছে এসেছি। দয়া করে আমাদের আপনার শিষ্য করে নিন। আমরা জাদু শিখতে চাই।"

কথা শুনেও জাদুকরের অবাক ভাব কাটল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ

ঘরে থেকে উনি দুর্বোধ ভাষায় কী সব বলতে শুরু করলেন। টাবলু তখন আগের ওই কথাগুলোই হিন্দি আর ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাল, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়েছে বলে মনে হল না।

তিনটে ভাষার একটাতেও জাদুকর উত্তর দিলেন না, তিনি হাত নেড়ে, গলার স্বর ওপরে তুলে ওই ভাষাতেই একটানা অনেক কিছু বলে যেতে লাগলেন। জাদুকরের একটা চোখের মণি সাদা, মুখে অসংখ্য রেখা, গায়ের হলুদ চামড়া সামান্য ঝুলে পড়েছে। জয়ের মনে হল, জাদুকর ওদের কথা বুঝতে পেরেছেন। এখন যা বলছেন তা কোনো ভাষা নয়, নিশ্চয়ই মন্ত্র। ওই মন্ত্রে এক্ষুনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে যাবে। অবিশ্বাস্য কিছু দেখার জন্য জয় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

জাদুকর হঠাৎ মন্ত্র পড়া থামিয়ে টাবলুর হাত ধরে ঘরে ঢোকার ইঙ্গিত করলেন। জাদুকরের পেছন-পেছন ওরা তিনজনেই ঢুকে পড়ল ঘরটায়। ঘরের দরজা জানলার মাপে, মাথা নিচু করে ঢুকতে হল। ঘরের ভেতরটা কী অন্ধকার, কী অন্ধকার! অন্ধকারে চোখ সয়ে যেতেই ওদের প্রথমে চোখে পড়ল একটা মোষের মাথার মতো কঙ্কাল। দেখেই ওদের মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা জলের মতো কী যেন নেমে গেল। নিজেদের বুকের ঢিবঢিব শব্দ নিজেরাই শুনতে পাচ্ছিল পরিষ্কার।

ঘরের কোণে একটা ছোট্ট চারপাই, তার ওপর কম্বল-বিছানা ডাঁই করা। বিছানার পাশেই একটা শুকনো গাছের ডাল আর কাঠকুটো। ওদিকে একটা ছোট জলের বালতি, তিন-চারটে টিনের কৌটো আর একটা কাঠের থালা।

ঘরে ঢুকে জাদুকরকে বেশ খুশি-খুশি লাগছিল। উনি দেয়ালে



টাঙানো একটা মস্ত ঝোলা নীচে নামালেন। লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের কাপড়ের তাপ্পি লাগানো ঝোলা। ঝোলা দেখেই ওদের তিন-জনের চোখ চকচক করে উঠল। ওরা তিনজনেই জানে, প্রত্যেক জাদুকরের কাছেই এইরকম একটা ঝোলা থাকে, ঝোলায় থাকে আশ্চর্য-আশ্চর্য সব জিনিস।

জাদুকর ঝোলা থেকে প্রথমেই যে জিনিসটি বার করলেন সেটা দেখে ওদের বুক কেঁপে উঠল। একটা বিশাল চকচকে ভোজালি। ভোজালিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে উনি একটা টিনের কৌটো বার করলেন। কৌটো থেকে কী যেন বার করে এগিয়ে দিলেন ওদের দিকে। আলুর মতো জিনিসগুলো আসলে কী, ওরা খুঁটিয়ে দেখেও চিনতে পারল না।

জাদুকর তখন ওর থেকে একটা টুপ করে নিজের মুখে ফেলে দিয়ে ইঙ্গিতে ওদের খেতে বললেন। ওগুলো তাহলে খাবার জিনিস। ওরা তিনজনে তিনটে তুলে নিল। টাবলু আর শংকর একটু ইতস্তত করে ওগুলো খেয়ে ফেলল, জয় কিন্তু খেতে গিয়েও পারল না. কী বিশ্রী গন্ধ! তা ছাড়া অন্য একটা সন্দেহ ঝট করে ওর মনের মধ্যে ঢুকে গেল। এগুলো খাবার পরেই ওরা যদি কালো কুকুর কিংবা ভেড়া হয়ে যায়! জয় খাবার ভান করে ওটা লুকিয়ে ফেলল পকেটের মধ্যে।

ওদের ওগুলো খেতে দেখে জাদুকর কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন, তারপর প্রায় ছুটে গেলেন ঘরের কোনায়। কাঠের থালায় পান্তা ভাত, ডাল আর আস্ত পেঁয়াজ নিয়ে এসে ওদের খাওয়ার জন্যে ইঙ্গিত করলেন। টাবলু বলল, "আপনি খান, আমাদের পেট ভর্তি। আপনি খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন, আমরা বিকেল নাগাদ আবার আপনার কাছে আসব!" বলে ও গড় হয়ে প্রণাম করল

জাদুকরকে, তারপর পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বার করে ওর পায়ের কাছে রাখল।

দেখাদেখি জয় আর শংকরও প্রণাম করল। টাবলু ফিসফিস করে বলে দিল, "গুরুদক্ষিণা দিস।"

প্রণাম আর দক্ষিণায় জাদুকর খুব খুশি। হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ওই দুর্বোধ ভাষায় অনেক কিছু বললেন ওদের। ওরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পরে টাবলু চকচকে চোখমুখ করে বলল, "ওই বইটায় জাদুকরের চেহারার যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে এর চেহারা হুবহু মিলে গেছে। এত তাড়াতাড়ি যে একে পেয়ে যাব ভাবতে পারিনি।"

শংকর উত্তেজিত হয়ে সায় দিল, "আমিও না। কিন্তু টাবলুদা, উনি আমাদের কথা বোঝেন না, আমরাও ওঁর ভাষা বুঝি না, জাদু শিখব কী ভাবে?"

"কেন, আমরা তো এখানে আরও দু-তিনদিন আছি, এর মধ্যে যদি তিব্বতী ভাষাটা শিখে নিই?"

জয়ের এই সমাধানে শংকর চটে উঠে বলল, "কী বললি? দু-তিনদিনের মধ্যে একটা নতুন ভাষা শিখে নিবি? কী আমার পণ্ডিত রে! জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো ইংরিজি শিখছিস, এখনও তো ইংরিজির নামে তোর গায়ে জ্বর আসে। বল তো অ্যাডহিয়ারের পরে কী প্রিপজিশন বসবে।"

ঝগড়াটা দানা বাঁধার মুখে টাবলু ওদের থামিয়ে দিয়ে শান্ত গলায় বলল, "অত বড় গুণীর কাছে ভাষাটা কোনো সমস্যাই নয়। উনি সব জানেন, তবে মনে হয় এখন কিছু না বোঝার ভান করে আমাদের পরীক্ষা করছেন।"

মাথার ওপর ঝলমলে সূর্য ছিল, হঠাৎ কোত্থেকে ভেসে এল রাশি-রাশি কালো মেঘ। দেখতে দেখতে চারদিক কালো হয়ে গেল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পাহাড়ের ওদিকে লুকিয়ে ছিল, সূর্য ঢেকে যেতেই ছুটে এল শাঁ-শাঁ করে। ওরা বেশ জোরে জোরে হাঁটছে, কিন্তু গা গরম হচ্ছে না একটুও। টাবলু বলল, "ছোট, মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে, আশেপাশে মাথা বাঁচাবার কোনো জায়গা নেই।"

ছুটে ছুটে বাজারের কাছে আসতে-না আসতেই ঝুপ-ঝুপ করে বৃষ্টি নেমে গেল। ওরা দৌড়ে গিয়ে একটা দোকানের ছাউনির নীচে দাঁড়াল। বৃষ্টি, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। এত গরম জামাকাপড় পরে থাকা সত্ত্বেও ওদের গা-হাত-পা কেঁপে যাচ্ছিল ঠকঠক করে।

জয় পকেটে হাত ঢোকাতেই কী একটা ঠেকল ওর হাতে, বার করে দেখে জাদুকরের দেওয়া সেই খাবারটা। সঙ্গে সঙ্গে ও খুঁটিয়ে দেখে নিল টাবলু আর শংকরকে, কই ওদের গায়ে তো কালো কুকুর কিংবা ভেড়ার কোন চিহ্ন ফুটে ওঠেনি, যেমন ছিল তেমনি আছে। তাহলে জাদুকর লোক ভাল। ভাল লোককে অবিশ্বাস করতে নেই, তাছাড়া এই খাবারটা না খাওয়ার কথা যদি জাদুকর মন্ত্রের জোরে জেনে ফেলেন! জেনে যদি ওর ওপর চটে যান! এইসব ভেবে জয় আঙুলের চাপে খাবারটা দু' টুকরো করে গিলে ফেলল।

একটু পরেই বৃষ্টি ধরে গেল, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া আগের মতোই আছে, আকাশ কালো মেঘে ভর্তি। ওরা নেমে পড়ল রাস্তায়, তারপরে জোর কদমে হাঁটতে লাগল হোটেলের দিকে। রাস্তার মোড় ঘুরতেই শংকর দেখল উল্টো দিক থেকে একটা লোক হেঁটে আসছে। লোকটার সঙ্গে বাসের সেই হাত-পা-প্লাস্টার-করা বুড়োটার চেহারার দারুণ মিল। তবে, এ-লোকটার বয়েস চল্লিশ-

পঁয়তাল্লিশ, আর সেই বুড়োটার বয়েস হবে সত্তরের কাছাকাছি।

শংকর বলল, "দেখ্ দেখ্, এই লোকটাকে, বাসের ঐ বুড়োটার মতো দেখতে না?" টাবলু আর জয় লোকটাকে একবার দেখে নিল, কোনো কথা বলল না। ওদের দুজনের মাথাতেই শুধু জাদুর কথা ঘুরছে। লোকটা শিস দিতে দিতে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

পাহাড়ী রাস্তায় ওঠাটা কষ্টের, কিন্তু নামাটা বেশ মজার, আর একটু উঠলেই ঢালু রাস্তা পাওয়া যাবে। ঢালু রাস্তা পেতেই ওরা এক নিমেষে অনেকটা চলে গেল। হঠাৎ টাবলু ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "দৌড়ো।" বলেই যে পথ ধরে আসছিল সেই পথেই ছুটতে লাগল বাঁই বাঁই করে।

কেন, কী জন্যে—জয় আর শংকর কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু ওরাও ছুটতে লাগল টাবলুর পিছু-পিছু। টাবলু বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। ছুটতে-ছুটতে জয় বলল, "টাবলুদা বোধ হয় ক্যামেরাটা ফেলে এসেছে।"

ছুটতেই ছুটতেই শংকর উত্তর দিল, "হতে পারে।"

দৌড়োতে দৌড়োতে ওরা আবার বাজারের কাছে চলে এল। টাবলু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হতাশ গলায় বলল, "পেলাম না। ইশ্ আমি কী বোকা!" জয় আর শংকর কথাটার মানে বুঝতে পারল না। ক্যামেরা তো টাবলুদার কাঁধেই ঝুলছে, তাহলে আবার ও কী হারাল! টাবলু মাথাব চুল খামচে ধরে বলল, "এত সামান্য ব্যাপার, অথচ একবারও আমার মাথায় খেলল না।"

"কী হয়েছে বলবি তো?"

"ওই যে ওই লোকটা···।"

"কোন্ লোকটা?"

"ওই যে লোকটা, বললি না বাসের বুড়োটার মতো দেখতে।"
"হ্যাঁ, কী হয়েছে তাতে ?"
"আরে, ওই লোকটাই তো সেই বুড়োটা।"
"বুড়োটা!"
"বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল, বুড়ো সাজা কী আর এমন কঠিন।"

টাবলুর কথা শুনে জয় আর শংকরের চোখ দুটো প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এল। টাবলু আফশোসের গলায় বলল "লোকটার হাতপায়ের প্লাস্টারগুলোও নকল। নকল না-হলে ভাঙা পায়ে কেউ ওভাবে ছুটতে পারে! বলা যায় না, ওই প্লাস্টারের মধ্যেই হয়ত চোরাই জিনিস ছিল। লোকটা নির্ঘাত দাগী স্মাগলার, তখনই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল যে, লোকটা ছদ্মবেশ ধরেছে।"

জয় আর শংকরের হাত-পা কেঁপে উঠল। শীতেও হাত-পা কাঁপে, কিন্তু এ কাঁপুনি সে কাঁপুনি নয়। শুধু কাঁপুনিই নয় সেই সঙ্গে গা-ও ছমছম করছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই, এখন যদি ওই লোকটা দলবল সমেত সামনে এসে হাজির হয়!

আকাশ আরও কালো হয়ে গেছে, চারদিকে চাপ-চাপ অন্ধকার। এমন সময় মিহি সুতোর মতো বৃষ্টি শুরু হল। টাবলু বলল, "এ বৃষ্টি এখন আর ধরবে না মনে হয়, চল হোটেলে ফিরে যাই।" ছুটে তিনমাথার মোড়ে পৌঁছুতেই বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল বেশ জোরে। ওরা একটা অফিস বাড়ির ঝুল-বারান্দার নীচে দাঁড়াল। একটানা বৃষ্টি চলল অনেকক্ষণ। পাহাড়ী জায়গায় জল দাঁড়ায় না, সমতল হলে ঠিক এক হাঁটু জল জমে যেত।

বৃষ্টি একবার থামতেই ওরা ছুটে হোটেলে ফিরে এল। টাবলুর ঘড়িতে তখন ঠিক দুটো। খিদেয় তিনজনেরই পেট চোঁ-চোঁ করছে।

ওরা সোজা খাবার টেবিলে বসে পড়ল। খাবার-দাবার সব রেডি ছিল, এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গরম-গরম ভাত, গরম ডাল, তরকারি, ডিমভাজা আর গাজর-শশা-পেঁয়াজের স্যালাড। এত খিদে পেয়ে গিয়েছিল যে, ওরা একটাও কথা না বলে খেতে শুরু করে দিল। রান্নার কী স্বাদ, মনে হচ্ছিল এত ভাল রান্না ওরা জীবনেও খায়নি। বাড়িতে যা খায় তার ডবল খেল তিনজনেই। খেয়েদেয়ে ওরা নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কাঠের চালে ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়ছে সমানে। এখন দুপুর অথচ জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে মনে হয় সন্ধে হয়ে গেছে, চারদিক অন্ধকার। আর কী শীত, গায়ে কম্বল জড়িয়েও ওদের শীত কাটতে চাইছিল না। টাবলু করুণ মুখ করে বলল, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না।"

বৃষ্টি না থামলে ওরা হোটেল ছেড়ে বেরোতে পারবে না। ছাতা, বর্ষাতি থাকলে অবশ্য ওরা বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু সে সব তো ওদের কাছে নেই। বৃষ্টি, স্রেফ বৃষ্টির জন্যেই ওদের জীবনের একটা মস্ত সুযোগ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। জাদুকরের কাছে এখন ওদের যাবার কথা, কথা দেওয়া আছে। বৃষ্টি থামাবার জন্যে ওরা তিনজনেই মনে-মনে ভগবানকে ডাকতে লাগল, কিন্তু এই পাহাড়ের ভগবানও বোধহয় ওদের ভাষা বোঝেন না, বৃষ্টি ধরার বদলে আরও বেড়ে গেল। দেখতে দেখতে আরও অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। তারপর একসময় টাবলু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মন খারাপ করে বলল, "সন্ধে হয়ে গেছে।"

সারা সন্ধে-রাত্তির ধরে বৃষ্টি হল, পরদিন সকালেও বৃষ্টি থামল না। কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওদের চোখে ব্যথা হয়ে

গেল, কিন্তু বৃষ্টি থামার কোনোরকম লক্ষণ চোখে পড়ল না কারও। দুপুরের দিকে একবার কিছুক্ষণের জন্য বৃষ্টি কমে এসেছিল, তারপরেই শুরু হল দ্বিগুণ জোরে। প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া, মাঝে-মধ্যে হোটেলের কাঠের চাল, কাঠের দেয়াল কেঁপে উঠছিল থথর করে, মনে হচ্ছিল এই বুঝি উড়ে যায়! সন্ধের পরে ঝড় থেমে গেল, কিন্তু বৃষ্টি থামল না।

দুদিন ধরে একটানা হোটেলে বসে বসে হাঁপিয়ে উঠেছিল টাবলু, জয় আর শংকর। বৃষ্টির জন্যে ওদের বিরাট একটা পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। জাদুকরের সঙ্গে দেখা না হলে এতটা আফশোস হত না। দেখা হল, তারপর আসল কাজ শুরু হওয়ার মুখেই বৃষ্টি!

মাঝরাত্তিতে হঠাৎ চাপা গুমগুম শব্দে ওদের তিনজনেরই ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা দূর থেকে ভেসে আসছে, কিন্তু কিসের শব্দ ওরা কিছুতেই বুঝতে পারল না। ভোর হতে না হতেই চেঁচামেচি, চিৎকারে ওদের ঘুম ভেঙে গেল আবার। ঘুম ভাঙতেই দেখে বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে, বৃষ্টি নেই একদম। কী সুন্দর সকাল, কিন্তু বাইরে এত চিৎকার কেন? গায়ে চাদর জড়িয়ে ওরা তিনজনেই ছুটে নীচে নেমে এল।

রাস্তায় পাহাড়ী লোকগুলোর চোখেমুখে আতঙ্ক। চিৎকার করতে করতে সবাই এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করছে। হঠাৎ ওদিকের বাড়ি থেকে একটা বুড়ী বেরিয়ে এসে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে সে কী কান্না! টাবলু একটা লোককে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে?” লোকটা হাতমুখ নেড়ে উত্তেজিত হয়ে দুর্বোধ ভাষায় একটানা অনেক কিছু বলে গেল, টাবলু একটা বর্ণও বুঝতে পারল না। এমন সময় হোটেলের লোকটার দেখা পাওয়া গেল, ওর কাছ থেকেই জানা

গেল পুরো ব্যাপারটা।

কাল মাঝরাত্তিরে বিশাল-বিশাল ধস নেমেছে রুটুংয়ে। সেই ধসে বহু ঘর বাড়ি এমন কী দুটো আস্ত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। লোক-জন মারা গেছে বিস্তর। রুটুংয়ে যাতায়াত করার যে-দুটো সেতু ছিল সে-দুটোও ভেসে গেছে নদীর জলে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নাকি এত বড় ধস নামেনি রুটুংয়ে।

এত বড় দুর্ঘটনার খবর শুনে ওদের তিনজনেরই খুব মন খারাপ হয়ে গেল। ওই যে বুড়ীটা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে নিশ্চয়ই ওর কেউ মারা গেছে ধসে। কাল মাঝরাত্তিরের চাপা গুমগুম শব্দের রহস্যও ওদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, ওগুলো নিশ্চয়ই ধস নামার শব্দ।

টাবলু বলল, "চল তো জাদুকরের খবর নিয়ে আসি।" এখানে জাদুকরই ওদের একমাত্র প্রিয়জন, সুতরাং তার খবর নেওয়া দরকার। ওরা জোর পায়ে হেঁটে, কিছুটা ছুটে বাজারের কাছে পৌঁছে গেল। বাজারটা পেরিয়ে যাবার পরেই রাস্তা একেবারে নির্জন। কিছুটা যাবার পরে ওরা অবাক হয়ে দেখল, রাস্তা জুড়ে একটা বিরাট পেয়ারা বাগান। সেদিন তো এখানে কোনো পেয়ারা বাগান ছিল না, তাহলে কি ওরা রাস্তা ভুল করেছে! কিন্তু রাস্তাই বা ভুল হবে কী ভাবে, বাজারের পেছন দিকে এটাই তো একমাত্র রাস্তা। টাবলু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ওপর দিকে আঙুল তুলে বলল, "দেখ দেখ।"

ওরা দেখল, রাস্তার সঙ্গে লাগানো উঁচু পাহাড়টার গা কে যেন চেঁছে দিয়েছে, অনেক জায়গা জুড়ে একটাও গাছপালা নেই, পাথুরে লাল মাটি বেরিয়ে পড়েছে। ওদের বুঝতে অসুবিধে হল না যে, পেয়ারা বাগানটা ছিল পাহাড়ের মাথায়, ধসে পড়েছে নীচে। ধস যে

এত ভয়ংকর ওদের ধারণাই ছিল না, দেখে গা শিউরে উঠল। বেশ কয়েকটা পেয়ারাগাছ ধসে পড়তে পড়তে মাটির সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেছে, তবে অনেকগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। সব গাছগুলোই ফলন্ত, ডাঁশা ডাঁশা পেয়ারা ঝুলছে গাছে।

হতভম্ব ভাব কাটার একটু পরেই ওরা তিন লাফে গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে শুরু করে দিল। পেয়ারাগুলো কী মিষ্টি, ভেতরটা লাল। শংকর বলল, "আজ আমরা পেয়ারা খেয়েই ব্রেকফাস্ট করব।" ওরা বিস্তর পেয়ারা খেল, ছড়াল তার দশগুণ, তারপর বড়-বড় পেয়ারায় দু-পকেট বোঝাই করে নেমে এল গাছ থেকে।

টাবলু বলল, "চল এবার জাদুকরের কাছে যাই।" ওরা পেয়ারা-বাগানটা পেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় গিয়ে পড়ল। কিছুটা এগোবার পরেই রাস্তাটা বেঁকে গেছে, ওই বাঁকটা নিলেই জাদুকরের ঘর দেখা যাবে, কিন্তু বাঁক নেবার পরেও ওরা ঘরটা দেখতে পেল না। কী আশ্চর্য! ঘরটা তো ওখানেই ছিল, গেল কোথায়!

টাবলু কিছুটা ছুটে গেল, তারপর আঁতকে উঠে বলল, "ধস।" জয় আর শংকরও দৌড়ে গেল, কাছাকাছি যেতেই ওদের পাগুলো যেন আটকে গেল মাটির সঙ্গে। জাদুকরের বাড়ির পেছনেই একটা গভীর খাদ, সেই খাদে নেমে গেছে ওপরের অনেক কিছু। লালচে মাটির একটা বিশাল রাস্তা চলে গেছে খাদের মধ্যে। অনেকটা জায়গা নিয়ে বিরাট একটা হাঁ, ওই হাঁয়ের ওপরেই ছিল জাদুকরের ঘর। ওরা পা টিপে টিপে খাদের ধারে গিয়ে উঁকি মারল নীচে! অতল খাদ, বাড়িঘরদোরের কোনো চিহ্নও ওদের চোখে পড়ল না।

তিনজনের কেউই কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। শংকর শুধু আস্তে আস্তে কী যেন বলল, কিন্তু ওর গলা এত ভার-ভার যে, ওর

কথা কেউ বুঝতে পারল না। আরও কিছুক্ষণ ওইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ওরা ফিরতে শুরু করল। তিনজনেরই এত মন খারাপ যে, কেউ কারও সঙ্গে কোনো কথা বলল না। বাজারের কাছাকাছি এসে টাবলু বলল, "আমার মন বলছে কী জানিস, জাদুকর মারা যাননি, উনি মন্ত্রের জোরে নিজেকে বাঁচিয়েছেন। কিছু বলা যায় না, উনি হয়ত নিজের ঘরটাকেও উড়িয়ে নিয়ে গেছেন অন্য কোথাও।"

কথাটা জয় আর শংকরের খুব মনে ধরল, এটাই তো স্বাভাবিক, যিনি মন্ত্র পড়ে পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারেন তিনি নিজের ঘর ওড়াতে পারবেন না ? এভাবে ভাবতে পেরে ওদের মন বেশ হাল্কা হয়ে গেল। ওরা পকেট থেকে পেয়ারা বার করে খেতে খেতে রাস্তার তিনমাথার মোড়ে এসে পৌঁছল।

পোস্টাফিসটা চোখে পড়তেই টাবলু বলল, "তিনরাত্তির কেটে গেল এখানে, আর দেরি করা যায় না, চল ছোটমামাকে এবার টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিই। টেলিগ্রাম যেতেও তো একটু সময় নেবে।"

পোস্টাফিসের কাউন্টারে যে লোকটা বসে ছিল ওদের কথা শুনে হিন্দীতে বলল, "টেলিগ্রাম তো এখন যাবে না।"

"কেন ?"

"ধসে লাইন-টাইন সব খারাপ হয়ে গেছে।"

"সে কী। সারবে কবে ? কদ্দিন লাগবে ?"

"কিছু বলা যায় না।"

"আন্দাজ ?"

"তা, কমসে কম পনেরো-বিশ দিন।"

"টেলিগ্রাম না যাক, চিঠি—চিঠি যাবে তো ?"

"কী করে যাবে? রুটুংয়ের যাতায়াত করার দুটো ব্রিজই ভেঙে গেছে, রাস্তাঘাটের অবস্থাও যাচ্ছেতাই। মানুষজন যেতে না পারলে চিঠি যাবে কী করে?"

ওরা তিনজনে মন খারাপ করে বেরিয়ে এল পোস্টাফিস থেকে। এখন উপায়! একে একে অনেককে জিজ্ঞেস করে, সব শুনে, ওদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। রুটুং থেকে বাইরে যাবার সব রাস্তাই ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। বাস-চলাচল এক মাসের আগে কোনোমতেই শুরু হবে না, কেউ-কেউ বলল তিন চার মাসও লেগে যেতে পারে। খাবার জলের পাইপ লাইন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, ফসলও নষ্ট হয়ে গেছে একদম। রুটুংয়ের মজুত খাবারও ফুরিয়ে যাবে সপ্তাহখানেকের মধ্যে। তারপর? আতঙ্কে পাহাড়ী লোকগুলোর হলুদ মুখ আরও হলুদ হয়ে গেছে।

সব দেখেশুনে টাবলু শুকনো মুখে বলল, "যে করেই হোক, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে।"

"কিন্তু বাসটাস তো নেই, যাব কী করে?"

"কিছু না পেলে হেঁটে যাব।"

"হেঁটে! রাস্তা চিনব কী করে?"

টাবলু কোনো কথা না বলে ওদিকের ছোট্ট পুলিশ-ফাঁড়িটায় ঢুকে পড়ল, ওর পেছন-পেছন গেল জয় আর শংকর। পুলিশ অফিসার চমৎকার বাংলা জানেন, সব শুনে বললেন, "অনেকটা রাস্তা, তোমরা কি অতটা হেঁটে যেতে পারবে?"

টাবলু কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই জয় বলল, "খুব পারব, হাঁটতে তো আমাদের খুব ভাল লাগে।"

ওর কথা শুনে পুলিশ অফিসার হেসে ফেলে বললেন, "ভেরি গুড।

তাহলে, ওয়েদার ভাল থাকলে তোমরা কাল আর্লি মর্নিংয়েই রওনা হয়ে যাও। এখানে চলে এসো, আমি তোমাদের সঙ্গে একটা লোক দিয়ে দেব, সে তোমাদের কিছুটা এগিয়ে দেবে। তারপর ম্যাপ দেখে হাঁটবে, আমি একটা ম্যাপ বানিয়ে দেব তোমাদের জন্যে। পথে দু-একটা গ্রাম পড়বে, রাস্তা চিনতে না পারলে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করে নিও। রাত্রে হল্ট করবে নাথান মিলিটারি ক্যাম্পে। ওখানকার ক্যাপটেন আমার খুব বন্ধু, আমি একটা চিঠি লিখে দেব। ও. কে ?"

পুলিশ অফিসার ওদের চেনেন না, জানেন না, অথচ ওদের জন্যে এত করছেন। টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই রীতিমত অভিভূত হয়ে পড়ল। কাল সকালে এখানে আসার কথা জানিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে অফিসার ওদের ডেকে বললেন, "সঙ্গে যথেষ্ট খাবার নিয়ে নেবে, পথে একদম খাবারদাবার পাবে না। আর একটা জিনিস নিতে কক্ষনো ভুলবে না—সেটা হল নুন, সঙ্গে অনেকটা নুন নিয়ে যাবে।"

"নুন!"

"হ্যাঁ, নুন। পথে অনেক জোঁক আছে। জোঁক ধরলেই জোঁকের মুখে নুন ছড়িয়ে দেবে, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে খসে পড়বে। নুন না দিয়ে টানাটানি করলে কিন্তু কিছুতেই ছাড়াতে পাড়বে না।"

মন দিয়ে কথাগুলো শুনে ওরা সোজা ফিরে এল হোটেলে।



# ৪

ভোরবেলায় ধরতে গেলে একই সঙ্গে, ওদের তিনজনের ঘুম ভেঙে গেল। বেড়াতে এসে এই দুতিনদিনের মধ্যেই ওদের ভোরে ওঠার চমৎকার অভ্যাস হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠেই ওরা কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাহ্! চমৎকার রোদ উঠেছে। ব্যাগ-ট্যাগ ওদের রাতেই গোছানো হয়ে গিয়েছিল। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে ওরা সোজা চলে গেল খাবার টেবিলে। ব্রেকফাস্ট সেরে দুপুরের খাবারের তিনটে প্যাকেট আর অনেকগুলো কমলালেবু নিয়ে নিল সঙ্গে। এছাড়া ওদের সঙ্গে আছে তিন টিন বিস্কুট, দুটো বড় কেক আর আড়াই বাক্স চকোলেট। পথে খাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ওরা যখন পুলিশ-ফাঁড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন পৌনে সাতটা বাজে।

ওরা পৌঁছবার একটু পরেই পুলিশ অফিসার এলেন। এসেই ওদের একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে আকাশের দিকে তাকালেন। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, "ওয়েদার খুব ভাল, তোমরা তাহলে রওনা হয়ে যাও। সুব্বা, সুব্বা।"

ওর ডাক শুনে ফাঁড়ি থেকে মাঝবয়েসী যে পাহাড়ী লোকটা বেরিয়ে এল তার নামই সুব্বা। সুব্বা এসে সেলাম ঠুকল। অফিসার পাহাড়ী ভাষায় ওকে কী সব বুঝিয়ে দিয়ে টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই হচ্ছে তোমাদের গাইড, কিছুটা পথ তোমাদের

সঙ্গে যাবে।”

উনি পকেট থেকে দুটো কাগজ বার করলেন। একটা ম্যাপ, ম্যাপটা টাবলুকে বুঝিয়ে দিলেন। অন্যটা মিলিটারি ক্যাম্পের ক্যাপটেনের নামে চিঠি। চিঠি দেখালে ক্যাপটেন ওদের রাত্রে থাকা-খাওয়ার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন। নাথানের পরে রাস্তা-ঘাট খুব একটা খারাপ হয়নি, সকালে হাঁটতে শুরু করলে দুপুরের মধ্যে বাস স্টপে পৌঁছে যাবে। ওখান থেকে বাসে চড়ে রেল স্টেশনে পৌঁছতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়।

একটু থেমে পুলিশ অফিসার বললেন, “তবে, ওয়ান থিং, তোমরা যদি কখনও দেখ পাহাড়ের ওপর থেকে নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরে যাবে। ধস নামার আগে পাহাড় থেকে নুড়ি, ছোটখাট পাথর—এইসব গড়িয়ে পড়ে। সাবধানে যাবে। তাহলে আর দেরি কোরো না, রওনা হয়ে যাও—গুড বাই।”

ওরা রওনা হতেই অফিসার বললেন, “দাঁড়াও দাঁড়াও, এক মিনিট, তোমরা কি আমার ওপর অ্যানয়েড হয়েছ? চটে গেছ?”

শুনে ওরা তিনজনই খুব লজ্জা পেয়ে গেল। শংকর বলল, “ছিঃ ছিঃ, কী যে বলেন, আপনি আমাদের জন্যে এত কিছু করলেন, আর আমরা আপনার ওপর চটে যাব!”

অফিসার বললেন, “তাহলে কেন তোমরা আমাকে থ্যাংকস দিলে না, গুড বাই করলে না?”

বলার সঙ্গে সঙ্গে টাবলু বলল, “থ্যাঙ্কিউ ভেরি মাচ। গুড বাই।” জয় আর শংকরও তাই বলল। অফিসার তাই শুনে মিটিমিটি হেসে হাত নেড়ে বললেন, “বাই।”

ওরা রওনা হয়ে গেল। আগে সুব্বা, পেছনে-পেছনে ওরা

তিনজন। কিছুটা হাঁটার পরে জয় পকেট থেকে চকোলেট বার করে টাবলু আর শংকরকে দিল। শংকর বলল, "সুব্বাকে দে।" সুব্বা কিছুতেই নেবে না, তিনজনে মিলে জোর করায় নিল। চকোলেট মুখে দিয়ে সুব্বার সে কী হাসি! সুব্বা অল্প-স্বল্প হিন্দী জানে। চকোলেট খাওয়ার পর থেকেই লোকটা ওদের খুব বন্ধু হয়ে গেল।

পিচের রাস্তা ধরে ওরা দিব্যি হাঁটছিল, হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখে রাস্তা উধাও। সামনে ছোট খাদের মতো, খাদে তালগোল পাকানো মাটি আর কাদা। কী ভয়ংকর ধস, ওরা এবার কোন্‌দিকে যাবে?

রাস্তার ওই অবস্থা দেখে সুব্বা একটুও বিচলিত হল না, চারদিক দেখে নিয়ে খাদের মধ্যে নামতে শুরু করে দিল। পেছন-পেছন ওরা। মাটি পেছল, তাই খুব সাবধানে পা টিপে-টিপে নামছিল। খাদের ভেতরে এর মধ্যেই খুব সরু একটা পায়ে-চলা পথ তৈরি হয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে ওরা অনেকটা হেঁটে ওদিকের পাহাড়ে গিয়ে উঠল। পাহাড়ের ধার দিয়েও সরু পথ, ওই পথ ধরে ওরা ঘুরে-ঘুরে পাহাড়ের যত ওপরে উঠছে, পাশের খাদ তত গভীর হচ্ছে। কোনো-কোনো জায়গায় ওদের একেবারে খাদের ধার দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল, হাঁটতে হাঁটতে খাদের দিকে তাকালে বুক কেঁপে ওঠে।

বেশ কিছুটা ওপরে ওঠার পরে হঠাৎ দেখে সামনের বিশাল পাহাড়ের অর্ধেক কে যেন ধারালো যন্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে দিয়েছে। ধস যে এত সাঙ্ঘাতিক, না দেখলে ওরা বিশ্বাসই করতে পারত না। নীচে অতল খাদ, খাদের একেবারে তলায় ফিতের মতো সরু পাহাড়ী নদী। ফিতের মতো নদীটা যে আসলে বিরাট, ওরা তিনজনেই বুঝতে পারল! এত উঁচু থেকে নীচের সব জিনিসই ছোট্ট-ছোট্ট দেখায়, কিন্তু

সত্যি-সত্যি ওগুলো ছোট্ট নয়।

সুব্বা বলল, এই কাটা পাহাড়ের গা বেয়ে ওপারে পৌঁছুতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। সর্বনাশ! ভাবলেই তো হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কী করে যাবে ওরা! পাহাড়টা মাঝখান দিয়ে কাটা, পাথরের দেয়াল, গাছপালা নেই যে ধরে ধরে যাবে। মানুষরা তো আর টিকটিকি নয় যে, খাড়াই দেয়াল বেয়ে যেতে পারবে। পার হতে গিয়ে যদি পা ফস্কায় তাহলে অত নিচু খাদের ভেতর থেকে ওদের শরীরের একটা টুকরোও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পাহাড়ের দেয়ালে আঙুল-দশেক চওড়া একটা খাঁজ আছে, ওটাই হচ্ছে পেরুবার একমাত্র রাস্তা। সুব্বা বলল, "পার হবার সময় কেউ নীচের দিকে তাকাবে না, তাকালে মাথা ঘুরে যাবে। আর কক্ষনো পা টিপে-টিপে হাঁটবে না, একটু বরং জোরেই হাঁটবে। বৃষ্টিতে মাটি-পাথর নরম হয়ে আছে, আস্তে হাঁটলে পায়ের তলায় মাটি খসে যাবে, আর খসে গেলেই—"

সব শুনে তিনজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। বুক ঢিব্-ঢিব্ করতে লাগল সমানে। সুব্বা তাড়া লাগাল, "দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেশি দেরি হয়ে গেলে বিকেলের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্পে পৌঁছুতে পারবে না। অন্য কোথাও থাকার জায়গা নেই, আর রাত্তির হয়ে গেলেই এই পাহাড়ে শের, ভাল্লুক বেরোয়।" কিন্তু সামনের মৃত্যুকূপের কাছে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ও ওদের তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছিল।

সুব্বা হঠাৎ ওদের তিনটে ব্যাগ কেড়ে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে পাহাড়ের ওই খাঁজ ধরে তরতর করে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে হাত নেড়ে ওদের আসতে বলল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টাবলু মরিয়া হয়ে বলল, "চল্।"

প্রায় দুশো ফুট বিপজ্জনক রাস্তা ওরা কী ভাবে যে পেরিয়ে এল, নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছিল না। ওদিকে পৌঁছেই ওরা মাটিতে বসে পড়ল ধপ্ ধপ্ করে, নিশ্বাস ফেলতে লাগল জোরে জোরে, যেন এতক্ষণ ওরা একবারও নিশ্বাস ফেলেনি।

সুব্বা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে-হাসতে বলল, "বাহাদুর।" প্রশংসা করল, কিন্তু ওদের বেশিক্ষণ বসতে দিল না। আবার হাঁটা শুরু হল। রাস্তা খারাপ, তবে আগের তুলনায় যথেষ্ট ভাল। দুপুর দেড়টা নাগাদ ওরা একটা গ্রামে এসে পৌঁছল। এখানকার গ্রামগুলো বেশ মজার, আট-দশটা ঘর নিয়েই একটা গ্রাম। গ্রামের লোকগুলো অবাক হয়ে টাবলুদের দেখছিল। সুব্বা এবার ফিরে যাবে, বাকি পথটা ওদের ম্যাপ আর গ্রামের লোকজন ভরসা।

সুব্বাকে ওরা তক্ষুনি-তক্ষুনি ছাড়ল না। ওকে দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে একটা গাছের নীচে বসে পড়ল। খাবারের তিনটে প্যাকেট চার ভাগ করে খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেল ওরা। খাওয়া-দাওয়া শেষ করেই সুব্বা ফেরার পথ ধরল। ওরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হল নাথানের দিকে।

পথ চিনতে ওদের অসুবিধা হচ্ছিল না, কারণ একটা পথই একটানা অনেক দূরে চলে গেছে। অনেকদূর পৌঁছবার পরে ওরা দেখে দুটো পথ দুদিকে বেঁকে গেছে। টাবলু ম্যাপ বার করল, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না। রাস্তায় আর কোনও লোকজনও নেই যে জিজ্ঞেস করবে। বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে একটা লোকের দেখা পেল। লোকটা বলে দিল, ডানদিকের রাস্তা। ডানদিকের রাস্তাটা খুব খারাপ, এই দিকটায় বেশি ধস নেমেছে।

দুর্গম পথ ধরে কিছুটা যেতে না যেতেই হঠাৎ আকাশ

অন্ধকার হয়ে এল। চাপ-চাপ কালো মেঘ আকাশে, সঙ্গে ঠাণ্ডা হাওয়া। যদি আবার বৃষ্টি নামে! ওদের সঙ্গে ছাতা-বর্ষাতি নেই, ধারে কাছে মাথা বাঁচাবার জায়গাও নেই কোথাও। টাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি চল।" কিন্তু যা রাস্তা, তাড়াতাড়ি যাবে কী করে, জোরে হাঁটতে গিয়ে জয় হোঁচট খেয়ে পড়ল একবার। ভেজা মাটিতে পড়ে ওর সারা গায়ে কাদা লেগে গেল, পাটাও ব্যথা-ব্যথা করছে। তবে, এসব এখন দেখবার সময় নেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওরা হাঁটতে লাগল।

চারটে বাজে মোটে, অথচ আকাশ এত অন্ধকার হয়ে এসেছে যে, মনে হচ্ছিল ছটা বেজে গেছে। টাবলু বলল, "এসে গেছি প্রায়, আর বেশি দূর নয়, তাড়াতাড়ি পা চালা।" আরও কিছুটা যাবার পরে দেখে সামনের পাহাড়ের বেশ কিছুটা ধসে গেছে খাদের মধ্যে। খাদটা আগের সেই খাদের মতো গভীর নয়, কিন্তু পড়ে গেলে নির্ঘাত ছাতু হয়ে যাবে। ভাঙা পাহাড়ের দেয়ালে সরু একটা পথের মতো। ওখানে পা দিয়েই শংকর "আঃ" করে চেঁচিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলল টাবলু। না ধরলে ঠিক খাদের মধ্যে পড়ে যেত শংকর। পাহাড়ের গায়ের পথটা জলে কাদায় দারুণ পেছল, ওর ওপর দিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে উপায়?

সেই সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে ওরা তিনজনেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শরীর আর চলছে না। ব্যাগ টেনে টেনে কাঁধে, হাতে প্রচণ্ড ব্যথা, পা টনটন করছে। হাওয়া এখন বেশ কনকনে। জয়ের চোখমুখ ছলছল করছে, পরপর কয়েকবার হাঁচল ও।

টাবলু বলল, "এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না। চল, পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাই, একটু ঘুর পথ হবে ঠিক, কিন্তু এ-ছাড়া আর কোনও

উপায় নেই।"

ওরা ছোট ছোট গাছপালা ধরে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। বেশ কিছুটা ওঠার পরে কিছুটা সমতল জায়গা। এবার ডান দিকে যেতে হবে। ডান দিকের জঙ্গল বেশ ঘন। জঙ্গলে ঢোকার মুখে লাফিয়ে পিছিয়ে এল শংকর। সাপ! একটা বিশাল পাহাড়ী সাপ অনেকটা জায়গা জুড়ে শুয়ে আছে। এত বড় সাপ ওরা কখনও দেখেনি। সাপ দেখে ওরা দৌড়ে পিছিয়ে এল অনেকটা, কিন্তু সাপটা ওদের তাড়া করা দূরে থাক, ফণা পর্যন্ত তুলল না। টাবলু বলল, "সাপটা বোধহয় জন্তু-জানোয়ার খেয়ে ঘুমোচ্ছে, চল আমরা ওদিক দিয়ে যাই।"

ওদিক দিয়ে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আন্দাজে-আন্দাজে দিক ঠিক করে হাঁটছে। জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও হাল্কা। হাঁটার শেষ নেই, অথচ লোকালয়ের কোনোরকম চিহ্ন ওদের চোখে পড়ছিল না। জঙ্গলের মধ্যে দিনের আলো এমনিতেই কম, সেই আলোটুকুও এক সময় নিবে গেল দপ্ করে। ওরা ব্যাগ থেকে টর্চ বার করে জ্বালল। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে হাতে টর্চ না থাকলে এক পা চলা অসম্ভব।

দিনের আলোয় নাথানের দিক আন্দাজ করে ওরা হাঁটছিল, কিন্তু অন্ধকার হতেই ওদের দিক ভুল হয়ে গেল একেবারে। জঙ্গল ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছিল। ওরা কি তবে গভীর জঙ্গলের দিকে হাঁটছে!

কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু পায়ের তলায় শুকনো পাতা ভাঙছে—মচ্ মচ্ মড়াৎ। ওরা প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, এই বুঝি সামনে দুটো হিংস্র চোখ জ্বলে উঠবে, চোখ দুটো বাঘ-ভাল্লুক কিংবা অন্য কোনো বুনো জানোয়ারের। মাঝে-মধ্যে সামনে লম্বা

দুটো ঠ্যাংয়ের মতো গাছের ঝুরি বা ডাল দেখে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। এই জঙ্গলটা অশরীরীদের থাকার পক্ষে আদর্শ জায়গা। ওদিকে আবার সাপের ভয়ে প্রতিটি পা ফেলছিল দেখে দেখে।

জয় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আলো! আলো!" টাবলু আর শংকর দেখল, একটু দূরে কালো অন্ধকার চিরে এক চিলতে আলো বেরিয়ে এসেছে। আলো, তার মানে নিশ্চয়ই ওখানে কোনো বসতি আছে, ছোট্ট একটা পাহাড়ী গ্রামও হতে পারে ওটা।

আলোর দিকে চোখ রেখে ছুটতে লাগল ওরা। কাছাকাছি পৌঁছে অবাক হয়ে দেখল একটা গুহার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে। গুহার মুখে ঠাসা গাছপালা। গাছপালার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে ওরা একটা ছোট দরজা দেখতে পেল। দরজাটা বন্ধ। দিনের বেলা হলে ওরা গুহা কিংবা দরজাটা দেখতেই পেত না।

ওরা কী করবে না করবে ভাবছে এমন সময় জয় খুব জোরে জোরে হেঁচে ফেলল দুবার। আর, সঙ্গে সঙ্গে গুহার দরজা খুলে তিনটে লোক ছুটে বেরিয়ে এল। ওদের এক হাতে টর্চ আর এক হাতে পিস্তল। টাবলুরা কিছু বোঝার আগেই লোক তিনটে ওদের ঘিরে ফেলল। উত্তেজিত গলায় পাহাড়ী ভাষায় কী সব বলতে বলতে লোকগুলো ওদের ঠেলে গুহার ভেতরে নিয়ে গেল। গুহায় লণ্ঠন জ্বলছে, সেই আলোয় টাবলু, জয় আর শংকর অবাক হয়ে দেখল তিনজন লোকের মধ্যে একজন সেই লোকটা। এই লোকটাকেই সেদিন ওরা রুটুংয়ে দেখেছিল, এই লোকটাই হাত-পা-ভাঙা বুড়োর ছদ্মবেশ ধরে ওদের সঙ্গে একই ট্রেনে, একই বাসে চেপে রুটুংয়ে এসেছিল। সেই বুড়োটা আর এই লোকটা যে একই মানুষ



ব্যাপারে ওদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

লোকটাও মনে হয় ওদের চিনতে পেরেছে, কিন্তু না চেনার ভান করে বলল, "তোমাদের কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আমাকে চেন তোমরা ?"

"আপনাকে···"

শংকর সত্যি কথাটাই বলে ফেলতে যাচ্ছিল, টাবলু ওর পা মাড়িয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, "না তো।"

লোকটা কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখানে তোমরা কী ভাবে এলে ?" টাবলু এবার সত্যি কথাই বলল, কিন্তু লোকটার চোখমুখ দেখে মনে হল টাবলুর কথা ও বিশ্বাস করেনি।

জয়ের চোখমুখ বেশ ছলছল করছে, বোধহয় ঠাণ্ডা লেগে গেছে, কোনোরকমে হাঁচি সামলে নিয়ে বলল, "আজ রাত্তিরের মতো দয়া করে আমাদের এখানে থাকতে দিন, কাল সকালেই আমরা চলে যাব।"

লোকটা নিষ্ঠুরের মতো হেসে উঠে বলল, "আমাদের এখানে থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু কেউ একবার ভুল করে এসে পড়লে তাকে আমরা আর ফিরে যেতে দিই না।"

শুনে অজানা ভয়ে শিউরে উঠল টাবলু, জয় আর শংকর।

এই লোকটা বাঙালী, বাকি দুটো পাহাড়ী। লোকটা পাহাড়ী ভাষায় ওদের সঙ্গে কী সব পরামর্শ করে দেয়ালের কাছে গিয়ে একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালটা ঘর্ঘর করে সরে গেল। দেয়ালের পেছনে একটা ঘর। লোকটা সেই ঘরে ওদের নিয়ে এসে বলল, "রাত্রে এখানে থাক, কাল সকালে তোমাদের বন্দোবস্ত হবে।" বেরিয়ে গিয়ে লোকটা আর একটা বোতাম টিপল। দেয়ালটা

বন্ধ হয়ে গেল আবার।

দেয়ালটা বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছুটে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা মারল। হাতে বেশ ব্যথা লাগল, কিন্তু এক চুলও সরল না দেয়ালটা।

ওরা হাতের টর্চগুলো জ্বালল। পাথরের দেয়াল, ঘরে একটাও জানলা-দরজা নেই। এক কোণে দুটো খাট পাতা, খাটে বিছানা-কম্বল। ওপর দিকে টর্চ ফেলে দেখে, সিলিংটাও পাথরের তৈরি। দেয়ালের মাথায় একদিকে একটা বড় ঘুলঘুলি, মাঝখানে একটা লোহার গরাদ। কিন্তু, ঘুলঘুলিটা প্রায় তিন-মানুষ উঁচুতে, ওটা দিয়ে যে বাইরে তাকাবে তার উপায় নেই।

ওরা কেউ কোনো কথা বলতে পারল না কিছুক্ষণ। এমন একটা বিপদের মধ্যে যে পড়বে, কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। আর এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। ওই লোকটার নিষ্ঠুর হাসি আর কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিল ওদের। · এখানে কেউ একবার এসে পড়লে তাকে আমরা আর ফিরে যেতে দিই না···কাল সকালে তোমাদের বন্দোবস্ত হবে···

কী বন্দোবস্ত হবে কে জানে, তবে সেটা যে খুব ভয়ংকর কিছু-একটা হবে, এটা সবাই বুঝতে পারছিল। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ায় জয়ের খুব কান্না পেয়ে গেল। যদি মায়ের সঙ্গে আর দেখা না হয়!

টাবলু বলল, “আজ আমরা পালা করে ঘুমোব, একসঙ্গে ঘুমোলেই কেলেঙ্কারি। দুজন ঘুমোবে, একজন জেগে থাকবে।”

“কেন? কেন?”

“একটা মতলব মাথায় এসেছে, দেখি কদ্দূর কী করা যায়।”

"কী মতলব ?"

"বলছি। আগে কিছু খেয়ে নিই। খিদে পায়নি তোদের ?"

একটু আগেই জয় আর শংকরের ভীষণ খিদে পেয়েছিল, কিন্তু বিপদে পড়ার পরেই ওদের খিদে মরে গেছে একদম। নেহাত টাবলুদা বলল তাই ব্যাগ খুলে ওরা খাবার-দাবার বার করল। কেক আর বিস্কুটগুলো কী দারুণ খেতে, কিন্তু এগুলো জয় আর শংকরের কাছে এখন বিস্বাদ লাগছিল। খেতে হবে তাই খাওয়া। টাবলুদা নিজে বেশ বেশি করে খেল।

খাওয়া হয়ে গেলে টাবলু বলল, "নে, তোরা এবার শুয়ে পড়। ঠিক দুঘণ্টা পরে শংকরকে ডেকে দিয়ে আমি শোব, আমাকে আবার দুঘণ্টা পরে ডেকে দিবি, বুঝলি ?" অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয় আর শংকর শুয়ে পড়ল। সারাদিনের প্রচণ্ড ক্লান্তির পরে ওরা শুয়ে-শুয়ে বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তা করতে পারল না, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

টাবলু ঘড়ি দেখে ঠিক দুঘণ্টা পরে শংকরকে ডেকে দিল। শংকর প্রথমে কিছুতেই উঠতে চাইছিল না, কিন্তু তারপরেই যেই মনে পড়ে গেল কোথায় শুয়ে আছে, অমনি লাফিয়ে উঠল। টাবলু ওকে চাপা গলায় বলল, "জেগে থাকবি। খবরদার ঘুমিয়ে পড়িস না। আমাকে ডেকে দিবি ঠিক দু'ঘণ্টা পরে। এই নে ঘড়ি।" টাবলু হাতঘড়িটা খুলে শংকরকে দিয়ে শোবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

শংকর বসে থাকল চুপ করে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখছিল, সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইছে না। এইভাবে বসে থাকতে থাকতে ও ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠে ঘড়ি দেখে—এ কী! তিনটে বেজে গেছে।

ধাক্কা দিয়ে ও টাবলুকে তুলে দিল। টাবলু ঘড়ি দেখে বলল, "ইশ্!

এত দেরি করে ডাকলি কেন?”

শংকর কী যেন কৈফিয়ত দিতে যাচ্ছিল, টাবলু মুখে আঙুল চেপে ওকে থামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, “জয়কে তোল।” জয় উঠে পড়ল।

টাবলু আস্তে-আস্তে বলল, “তোরা ব্যাগ থেকে দড়ি আর ছুরি বার কর।” ওরা বার করল। টাবলু নিজের আর ওদের দড়ি দুটো এক-সঙ্গে পাকিয়ে পাকিয়ে একটা মোটা দড়ি বানাল। তারপর সব চাইতে বড় ছুরিটার পেটে দড়ির একটা ধার বাঁধল।

খাটের ওপরদিকে ঘুলঘুলিটা, টাবলু বলল, “ওই ঘুলঘুলিটার ওপরে টর্চের আলো ফেল।” শংকর আলো ফেলল। টাবলু খাটের ওপরে দাঁড়িয়ে ছুরি-বাঁধা দড়িটা ঘুলঘুলিটার গরাদ লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। ছুরিটা তিন চারবার দেয়ালে, সিলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল।

টাবলুর মতলবটা জয় আর শংকরের কাছে পরিষ্কার, উত্তেজনায় ওদের গা-হাত-পা কেঁপে উঠছিল মাঝে-মধ্যে। ছুরিটা হঠাৎ একবার গরাদে লেগে ঠন্‌ন্‌ন্ করে শব্দ তুলতেই ওরা চমকে উঠল। নিস্তব্ধ রাতে এই মৃদু শব্দটাই খান খান হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। টাবলু দেয়ালে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল, এই শব্দ আর কারও কানে গেছে কি না। না, কোথাও আর কোনো শব্দ উঠল না। তার মানে কেউ শুনতে পায়নি।

আরও কয়েকবার ওই ভাবে চেষ্টা করতে করতে ছুরি সমেত দড়িটা জড়িয়ে গেল ঘুলঘুলির গরাদে। টাবলু বলল, “জয়, তুই আমাদের মধ্যে সবচাইতে হাল্কা, আস্তে আস্তে দড়িটা বেয়ে ওঠ, উঠে দড়িটা শক্ত করে গরাদের সঙ্গে বেঁধে দে।”

নীচে থেকে টাবলু আর শংকর কিছুটা ঠেলে ওপরদিকে তুলে দিল জয়কে, তারপর ও আস্তে আস্তে দড়ি বেয়ে উঠে পড়ল বড় ঘুলঘুলিটায়। গরাদে শক্ত করে বাঁধল দড়িটা। একটাই গরাদ, গরাদের ফাঁক দিয়ে ওরা দিব্যি গলে যেতে পারবে বাইরে।

টাবলু নীচে থেকে চাপা গলায় বলল, "শাবাশ! এবার নেমে আয়।"

জয় নেমে এলে টাবলু উঠল ওপরে। ঘুলঘুলি দিয়ে মাথা গলিয়ে বাইরে তাকাল। চাঁদের আলোয় সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটু দূরে জঙ্গল, পাহাড়। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলে ওদের কেউ আর খুঁজে পাবে না। কিন্তু, কেউ কোথাও নেই তো! টাবলু এদিক-ওদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। না, কোথাও কেউ নেই।

এই ঘুলঘুলিটার লাগোয়া, কোনাকুনি আর একটা ঘুলঘুলি। ঘুলঘুলির মুখে ঝাপসা হলুদ আলো, তার মানে ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ জেগে আছে কি!

টাবলু এক হাতে গরাদ ধরে, শরীরের বেশ কিছুটা বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে ওই ঘুলঘুলিটার মুখে চোখ রাখল। ঘরটা কাঠের বাক্স আর ঝুড়িতে বোঝাই। বাক্সগুলো চায়ের বাক্সের মতো, আর ঝুড়িগুলো কমলালেবুর ঝুড়ির মতো। কোণের দিকে কার যেন পা। ও কোনো-রকমে মাথাটা আর একটু বাড়াতেই একটা লোককে দেখতে পেল। লোকটার মাথায় টুপি, গায়ে ওভারকোট, লোকটা ঝুঁকে পড়ে একটা কোট সেলাই করছে। লোকটা বোধহয় পাহারাদার।

টাবলু বাইরের দিকটা আর একবার দেখে নিয়ে নীচে নেমে এসে জয় আর শংকরকে ফিসফিস করে বলল, "খুব সাবধানে পালাতে হবে, একটুও শব্দ করবি না, পাশের ঘরে একটা



লোক জেগে আছে।"

টাবলু ব্যাগ থেকে আর একটা দড়ি বার করে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বলল, "শোন, আগে আমি বেরিয়ে যাব। এই দড়িটার সঙ্গে ওই দড়িটা বেঁধে দিচ্ছি। আমি নেমে যাবার পরে তোরা এই দড়িটা ধরে টানলে মোটা দড়িটা আবার তোদের হাতে চলে আসবে। আর, আমি ঘুলঘুলিতে ওঠার পরে তোরা দড়িতে তোদের ব্যাগ বেঁধে দিবি, আমি ব্যাগগুলো নিয়ে নেমে যাব। সাবধান! সাবধানে আসবি, একদম শব্দ করিস না।"

টাবলু সরু দড়িটার সঙ্গে মোটা দড়িটা বেঁধে উঠে গেল ওপরে। ওঠার পরে জয় আর শংকর দড়ির সঙ্গে ওদের ব্যাগ বেঁধে দিল। টাবলু ওগুলো টেনে তুলল, তারপর ব্যাগসমেত দড়ি বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে নেমে গেল আস্তে আস্তে।

ও নেমে পড়ার পরে সরু দড়িটা ধরে টানতেই মোটা দড়িটা হাতে এসে গেল জয় আর শংকরের। একইভাবে দড়ি বেয়ে বেরিয়ে গেল জয়। এবার শংকরের পালা। একা-একা থাকার জন্যে ওর ভীষণ বুক ঢিব-ঢিব করছিল। দড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মনে হল হাতে জোর নেই একদম। হাতে জোর নেই মনে হতেই ওর গায়ের জোরও যেন কমে গেল। যদি ও পালাতে না পারে! কিন্তু, পালাতে না পারার পরিণাম তো ভয়ংকর। ওই লোকগুলো ওকে আর আস্ত রাখবে না।

মরিয়া হয়ে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠল শংকর। ঘুলঘুলির গরাদ চেপে একটু দম নিয়ে দড়িটা ধরে ও বাইরে ঝুলে পড়ল। হাতের মুঠো থেকে দড়ি একবারও আলগা হয়নি, কিন্তু মাটিতে পা দেবার সময় ও টাল সামলাতে পারল না, পড়ে গেল ধপ করে। নীচে নুড়ি-বিছানো ঢালু জমি, মাটিতে পড়ার পরে দু-পাক গড়িয়ে গেল শংকর। নিস্তব্ধ রাতে

সামান্য এই শব্দটাকেই মনে হল বাজ পড়ার শব্দ। শংকর অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা অন্য শব্দ শুনতে পেল। কে যেন ছুটে আসছে এদিকে। টাবলু জয় আর শংকরকে দুহাতে টেনে নিয়ে ওপাশের দেয়ালের আড়ালে সরে গেল।

একটু পরেই ওখানে টর্চের গোল আলো এসে পড়ল, আলোর পেছন-পেছন একটা লোক। লোকটার এক হাতে ভোজালি, অন্য হাতে টর্চ। লোকটা কাছাকাছি এসে টর্চের আলো ঘোরাতে লাগল চারদিকে। দেয়ালের ওপর দিয়ে আলো ঘুরে গেল, দেয়ালের পেছনেই ওরা। লোকটা এদিক-ওদিক ঘুরে কিছু দেখতে না পেয়ে ফিরে যাবার সময় হঠাৎ ঘুলঘুলির গরাদ থেকে ঝুলে থাকা দড়িটা দেখতে পেল। দড়িটা কয়েকবার টানাটানি করে লোকটা বোধহয় ধরে ফেলল রহস্যটা। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকেই ফিরে যেতে লাগল জোর পায়ে।

দেয়ালের পাশ দিয়ে যাবার সময় টাবলু হঠাৎ নিঃশব্দে কয়েক পা ছুটে গিয়ে লোকটার পিঠে টোকা মারল। লোকটা চমকে ঘুরে তাকাতেই টাবলু প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল লোকটার মুখে। লোকটা আপ্ বলে ছিটকে মাটিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল। পরপর দু-বছরের ইণ্টার-স্কুল বক্সিং চ্যাম্পিয়ন টাবলুর এক ঘুষিতেই অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা। টাবলু জয় আর শংকরের দিকে তাকিয়ে বলল, "পালা।" চাঁদের আলোয় জঙ্গল লক্ষ্য করে ওরা ছুটতে লাগল প্রাণপণে।

ছুটতে ছুটতে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল। সন্ধেবেলায় এই জঙ্গলে ঢুকে ওদের কী ভয়ই না করছিল, আর এখন মনে হল, জঙ্গলের মতো নিরাপদ আশ্রয় বোধহয় পৃথিবীতে আর দুটো নেই। জঙ্গল গভীর না হওয়া পর্যন্ত ওরা ছুটতে লাগল সমানে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে



এসে টাবলু হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "ওই লোকটাকে না মারলে লোকটা তক্ষুনি গিয়ে আমাদের পালাবার কথা বলে দিত সবাইকে। লোকটা মনে হয় আধঘণ্টাটাক অজ্ঞান হয়ে থাকবে, এই আধঘণ্টার মধ্যে আমরা অনেক দূর চলে যাব।"

কিছুক্ষণ হাঁটার পরে জঙ্গলের ঘন ডালপালা ভেদ করে আবছা আলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ওই আলো দেখে লাফিয়ে উঠে জয় বলল, "ভোর হচ্ছে।" আর একটু হাঁটার পরেই পরিষ্কার ভোরের আলো ফুটে উঠল চারদিকে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির। গাছের মাথায় যে এত পাখি বসে আছে, রাতের অন্ধকারে একবারও বোঝা যায়নি। আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পরে ঘন জঙ্গল ফুরিয়ে গেল। খোলা জায়গায় এসে ওরা ভাল করে তাকাল আকাশের দিকে। আকাশের একদিক লাল করে সূর্য উঠছিল।

দেখতে দেখতে সূর্য দূরের নিচু পাহাড়টার মাথায় লাফিয়ে উঠল। চারদিক এখন বেশ পরিষ্কার, কুয়াশা কেটে গেছে অনেকটা। ধারে-কাছে কোথাও রাস্তাঘাটের কোনোরকম চিহ্ন নেই। একটু ইতস্তত করে ওরা সোজা হাঁটতে লাগল।

জয় আর শংকরের আগের মতো বুক ঢিবঢিব করছে না, কিন্তু নিরাপদ জায়গায় না পৌঁছনো পর্যন্ত ওরা পুরোপুরি নির্ভয় হতেও পারছে না। টাবলুদার বুদ্ধি, সাহস আর প্রচণ্ড ঘুষির কথা ভাবলে এখনও উত্তেজনায় ওদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তবে, প্রশংসা করতে গিয়ে ওরা ধমক খেয়েছে টাবলুর কাছে। টাবলুর মুখ বেশ গম্ভীর, আরও গম্ভীর গলায় বলেছে, "চুপ কর, বিপদ এখনও কাটেনি।" ধমক খেয়ে জয় আর শংকর দুজনেই ভেবে রেখেছে, এবার

বিপদে পড়লে এমন-কিছু একটা করতে হবে যাতে টাবলুদার পর্যন্ত তাক লেগে যায়।

আরও কিছুটা হাঁটার পরে একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে ঝিরঝির-ঝিরঝির শব্দ ভেসে এল। শব্দ শুনে চমকে উঠল জয় আর শংকর। অপরিচিত কোনো শব্দ শুনলেই ওদের কেমন যেন গা ছমছম করে উঠছিল, যদি আবার ওদের হাতে পড়ে যায়!

টাবলু কিন্তু ওই শব্দটা লক্ষ করেই হাঁটতে লাগল। একটু পেছনে জয় আর শংকর। পাথরের ওপরে উঠতেই ওরা খুব সরু একটা ঝর্না দেখতে পেল। সামান্য উঁচু থেকে ঝরাপাতার ওপরে ঝর্নার জল আছড়ে পড়ছে, শব্দ উঠছে ঝিরঝির ঝিরঝির। জল দেখেই জয় আর শংকর টের পেল যে, তেষ্টায় ওদের গলা কাঠ হয়ে গেছে। আঁজলা ভরে জল খেল তিনজনেই। কী মিষ্টি জল। জল খেয়ে, চোখেমুখে জল ছিটিয়ে তিনজনেই বসে পড়ল বড় পাথরটার ওপরে। টাবলু এই প্রথম মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "কী রে, খাওয়াদাওয়া হবে না? ভীষণ খিদে পেয়ে গেছে যে।"

জয় আর শংকর তেষ্টা পাওয়ার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল, খিদে পাওয়ার কথা যে ভুলে যাবে তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে।

জয় বলল, "আমার খিদে পায়নি, তোরা খা।"

শংকর বলল, "আমারও খেতে ইচ্ছে করছে না।"

ওদের কথা শুনে টাবলু গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, "বললাম না, বিপদ এখনও কাটেনি, আরও বড় বিপদ হয়ত আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বিপদে পড়লে সবার আগে কিসের দরকার বল তো? দরকার সাহস আর বুদ্ধির। পেটে খিদে থাকলে সাহসও দেখাতে পারবি না, বুদ্ধিও খুলবে না। নে, খেয়ে নে চটপট।"

টাবলু ব্যাগ খুলে কেক আর বিস্কুট বার করল। জয় আর শংকর খাব না খাব না করেও দিব্যি খেল। খাওয়াদাওয়া করে তিনজনে আবার ঝর্নার জল খেল পেট ভরে। টাবলু বলল, "বেশি করে জল খেয়ে নে, আবার কোথায় জল পাব তার ঠিক নেই।"

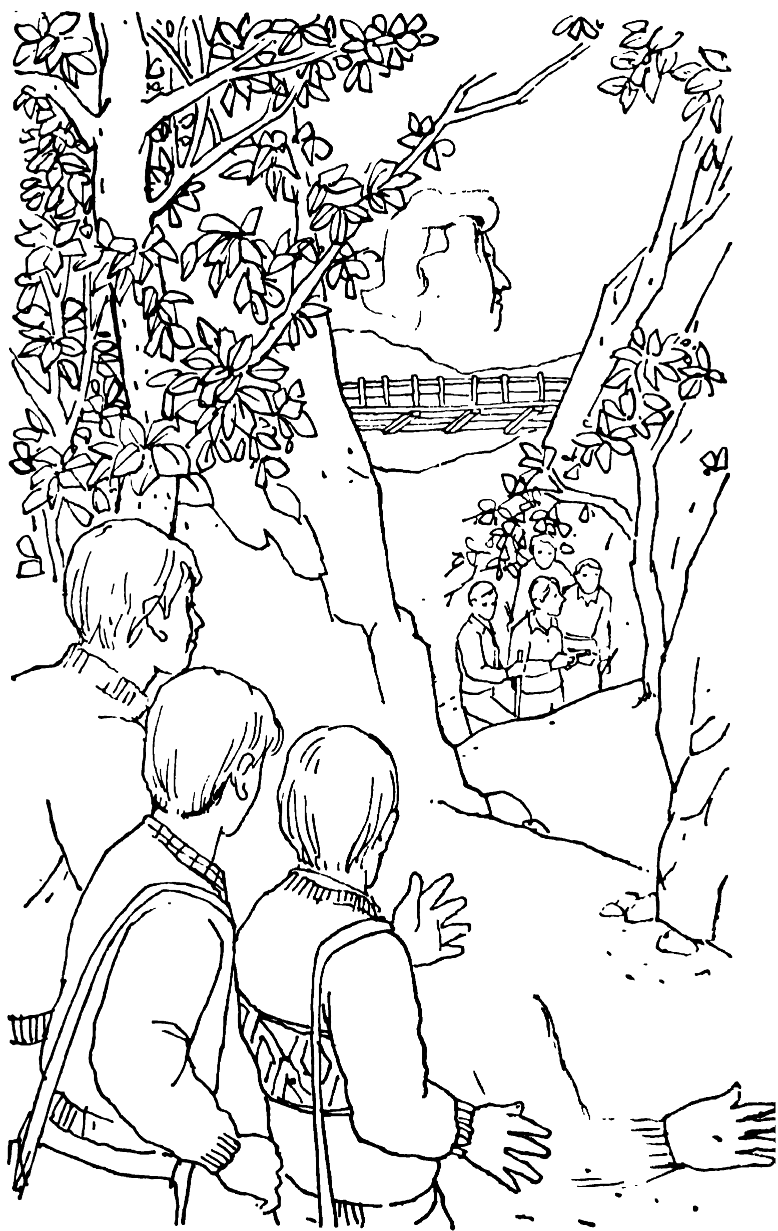
খাওয়ার পরে তিনজনেরই শরীর মন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল। জয় ব্যাগ খুলে বেশ কয়েকটা কমলালেবু বার করল, তার পর তিন ভাগ করে বলল, "এগুলো পকেটে রেখে দে, জল না পেলে লেবু খাব আমরা।"

টাবলু হেসে উঠে বলল, "দেখছিস শংকর, খেয়েদেয়ে জয়ের কেমন বুদ্ধি খুলে গেছে।" ওর কথা শুনে জয় আর শংকর দুজনেই হেসে ফেলল।

ঝর্নার জলের সরু নালাটার ধার দিয়ে ওরা হাঁটতে লাগল। টাবলু বলল, "ঝর্নার জলই আমাদের গাইড। নালাটা যেদিকে গেছে আমরাও সেদিকে যাব। গাঁয়ের কোনো লোক নির্ঘাত জল নিতে আসবে, আমরা তার কাছ থেকেই রাস্তার খোঁজ পেয়ে যাব।"

কথাটা জয় আর শংকরের খুব মনে ধরে গেল। সত্যিই তো! ওরা রুটুংয়ে থাকার সময় দেখেছে, পাহাড়ের লোকরা ঝর্নার জল খায়। সুতরাং জল খেতে কিংবা নিতে কেউ-না-কেউ আসতে পারে।

হেঁটে হেঁটে ওদের পা ব্যথা হয়ে গেল। কই, একটা লোকেরও তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। বুনো ঘাস, আর চারদিকের জংলী গাছপালা দেখে মনে হয়, এদিকে কেউ কখনও আসে না। কিন্তু, বাঁক নিতেই ওরা নালার ওপরে একটা ছোট্ট সাঁকো দেখতে পেল, সাঁকোর দুদিকে পায়ে হাঁটার সরু পথ। দুটো পথের যে-কোনো একটা ধরলেই ওরা লোকালয়ে পৌছতে পারবে। উত্তেজিত গলায় শংকর



কী যেন বলতে যাবে ঠিক তক্ষুনি সাঁকোর নীচে থেকে চারটে পাহাড়ী লোক ওপরে উঠে এল। একজনের হাতে পিস্তল, ওদের দিকে তাক করা।

পিস্তল হাতে লোকটা কী যেন বলতেই বাকি তিনজন ছুটে এসে টাবলু, জয় আর শংকরকে ধরে ফেলল। ওই লোকটা তারপর এগিয়ে এসে পিস্তলটা টাবলুর বুকে ঠেকিয়ে বলল, "আগে চলো। ভাগ্‌নেকা কৌশিশ করোগে তো গোলি মার দুংগা।"

লোক তিনটে টাবলু, জয় আর শংকরের হাতের আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে শক্ত করে ধরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। ওদের পেছন পেছন পিস্তল হাতে লোকটা।

এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল এক নিমেষে। জয় আর শংকর ব্যাপারটা ভাল করে বোঝার আগেই দেখে ধরা পড়ে গেছে। তখন ওরা দুজনেই ভেবে রেখেছিল যে, আবার যদি বিপদে পড়ে তাক-লাগানো কিছু একটা দেখিয়ে দেবে সবাইকে। কিন্তু, কোথায় গেল সেই পরিকল্পনা! উদ্বেগ, পরিশ্রম আর দুশ্চিন্তায় দুজনেরই গা-হাত-পা ঝিমঝিম করছে। জয়ের হঠাৎ গলার ভেতরটা ভারী হয়ে উঠল, কান্না পাওয়ার আগে যেমন হয় ঠিক সেইরকম। টাবলু মুখ সামান্য নিচু করে গম্ভীর হয়ে হাঁটছিল।

আবার সেই জঙ্গল। জঙ্গল পেরিয়ে ওরা সেই গুহার সামনে এসে দাঁড়াল। ঠাসা গাছপালার আড়ালে গুহাটা। জানা না থাকলে কারও বোঝার সাধ্যি নেই যে, এখানে এত বড় একটা গুহা আছে। ওরা কাছাকাছি আসতেই গুহার দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

বাইরের চড়া রোদ্দুর থেকে গুহার আবছা আলোয় এসে ওরা

কিছুই দেখতে পেল না প্রথমে। একটু পরেই ওদের চোখ সয়ে গেল। বুড়োর ছদ্মবেশ ধরেছিল যে লোকটা, সেই লোকটা সামনে দাঁড়িয়ে। লোকটার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত ওদের তিনজনকে দেখে নিয়ে লোকটা কর্কশ গলায় বলল, "তোমাদের আমি সাদাসিধে ছেলে ভেবে ভুল করেছিলাম। খুব চালাকি শিখেছ, না? তোমরা তো ছেলেমানুষ, চালাকি করে আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে টেক্কা দিতে পারেনি। এখান থেকে পালাবার সবকটা রাস্তা আমি বন্ধ করে রেখেছিলাম, আজ হোক, কাল হোক, ঠিক ধরা পড়ে যেতে তোমরা।"

কথা বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে টাবলুর জামার কলার ধরে খুব জোরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, "তোমার খুব ঘুষির জোর হয়েছে, না? একটু পরেই তোমাদের সব জোর শেষ করে দেব।"

জয়ের গলার ভেতরটা আরও ভার-ভার হয়ে গেছে, আর একটু পরেই বোধহয় ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু লোকটাকে টাবলুর কলার টানতে দেখে হঠাৎ ওর রাগ হয়ে গেল ভীষণ। ও বেশ চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হবে না কিন্তু বলে দিচ্ছি। অত বড় লোক—ছোটদের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? ছোটলোক, অসভ্য।"

জয়কে রাগতে দেখে লোকটা বিশ্রীভাবে হেসে উঠে বলল, "অ্যা, রোগাপটকা ছোকরা, তার আবার তেজ দেখ। একটু দাঁড়াও, সব রাগ তোমাদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। আর তোমাদের বাড়ি ফিরতে হবে না।"

বাড়ির কথা বলতেই জয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। ওর গলা ভার হয়েই ছিল, চোখ ছলছল করছিল, আর সামলাতে

পারল না নিজেকে, ওর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে মাটিতে পড়ল টপ টপ করে।

লোকটা দুর্বোধ ভাষায় একটা পাহাড়ী লোককে কী যেন বলল। লোকটা এগিয়ে এসে ওদের পকেটে হাত ঢুকিয়ে, কোমর টিপে সার্চ করতে শুরু করল। ওদের পকেটে টাকা পয়সা, চকোলেট, লেবু আর ডট পেন ছিল, লোকটা সে-সব কিছু নিল না, শুধু টাবলুর পকেট থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা বার করে নিয়ে ওই লোকটাকে দিল।

লোকটা ছোট্ট চিঠিটা বার করে পড়ে নিয়ে বলল, "এ চিঠি কার?"

টাবলু উত্তর দিল, "আমাদের।"

"তোমাদের?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, এটা তো নেপালে যাবার চিঠি।"

"হ্যাঁ, আমরা নেপালেই যাচ্ছি। চিঠিটা সতুদা লিখে দিয়েছে। নেপালে আমার ছোট মামা থাকে।"

"এটা কি নেপাল যাবার রাস্তা?"

"এদিক দিয়েও যাওয়া যায় শুনেছি।"

"তা যায়, কিন্তু নেপাল যাবার জন্যে কেউ এখানে আসে না। রুটুংয়ে কেন গিয়েছিলে?"

"এমনি।"

"এমনি! এমনি-এমনি কেউ কোথাও যায় না। সত্যি করে বলো কেন গিয়েছিলে?"

"বলছি তো এমনি।"

"আবার এমনি! কথা কী করে বার করতে হয় আমি জানি।"

লোকটা খ্যাপা জন্তুর মতো টাবলুর দিকে এগোতেই টাবলুদের পেছন থেকে জড়ানো ভারী গলায় কে যেন বলে উঠল, "পল্, কাম হিয়ার।"

টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই পেছন ফিরে দেখল, একদম পেছনদিকে চেয়ারে এক সাহেব বসে আছে। পরনে বুক-খোলা পাঞ্জাবি আর প্যান্ট। মুখে চাপ দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল। সাহেবের মুখটা অসম্ভব লাল, হাতে একটা লম্বা সিগারেট।

পল্ নামে ওই বাঙালী লোকটা সাহেবের কাছে এগিয়ে গেলে সাহেব ওর হাত থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা নিয়ে পড়ে কী যেন বলল ফিসফিস করে। শুনতে শুনতে পলের চোখমুখ চকচক করে উঠল। ও বলল, "রাইট, রাইট ম্যাক।"

একটু পরে লোকটা ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, "তোমাদের কপাল খুব ভাল, সাহেব তোমাদের ছেড়ে দিতে বলেছে। শুধু ছেড়ে দেওয়াই নয়, একেবারে নেপালে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নেপালে যাচ্ছি, তোমরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। আমরা বিকেলে রওনা হব।"

শুনে ওরা তিনজনেই অবাক হয়ে গেল ভীষণ। জয় আর শংকর ঘুরে ঘুরে সাহেবকে দেখতে লাগল। ইশ্ কী ভাল লোক সাহেব! পুলিশ অফিসারের মতো একেও ধন্যবাদ জানাবার জন্য ছটফট করছিল শংকর আর জয়। কিন্তু, লাল টুকটুকে সাহেবের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা সাহস পাচ্ছিল না।

ওদের আবার কাল রাত্রের সেই ঘরটায় নিয়ে যাওয়া হল। তবে, এবার আর ঘরের দরজা বন্ধ করা হল না। ওদের পিছু-পিছু দুটো পাহাড়ী লোক এসে ঘরের মধ্যে বসে থাকল গ্যাট হয়ে। বসে আছে

তো বসেই আছে, ওঠার আর নাম নেই। এরা যে পাহারাদার, ওদের তিনজনের কারোরই বুঝতে অসুবিধা হল না।

লোকদুটো বাংলা বোঝে না, কিন্তু কেউ মুখের সামনে চুপ করে বসে থাকলে কথা বলা যায়! ওদের তিনজনের কেউই কথা বলল না অনেকক্ষণ। বিপদ নেই জেনে জয় আর শংকরের মন বেশ হাল্কা হয়ে গেছে, কিন্তু টাবলুর মুখ অসম্ভব গম্ভীর। গম্ভীর মুখ করে তখন থেকে কী যেন ভেবে যাচ্ছে!

দুপুরে জয় চাপা গলায় টাবলুকে বলল, "ওই লোকটার গায়ের রং কুচকুচে কালো, অথচ সাহেবদের মতো নাম—পল্।"

টাবলু উত্তর দিল, "সাহেবী উচ্চারণে পল্, আসলে বোধহয় পল্ নয়।"

"কী তবে?"

"পাল, পদবী পাল।"

"আমরা তাহলে ওকে পালবাবু বলে ডাকব।"

জয়ের কথা শুনে টাবলু আর শংকর হেসে ফেলল। ধরা পড়ার পরে এই ওদের প্রথম হাসি। হাসির পরে আবার চুপচাপ।

বিকেলে পালবাবু এসে বলল, "চলো, এবার বেরোতে হবে।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনটে লোক মোটা কালো কাপড় দিয়ে ওদের চোখ বাঁধতে শুরু করল।

শংকর প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, টাবলু ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "যা করছে করুক, আপত্তি করে লাভ নেই।"

চোখ বাঁধা হয়ে গেলে লোক তিনটে ওদের হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। তিনজনের কেউই কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিল না। তবে অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছিল। সব মিলিয়ে বোধহয় জনাদশেক লোক হবে।

বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু-হু করে। এমন সময় ঘর্ঘর করে শব্দ উঠল, মনে হয় গুহার দরজা বন্ধ হচ্ছে। শব্দটা থামতেই একটু দূর থেকে পালবাবুর গলা শোনা গেল, "চলো এবার।" বলতেই ওদের হাত ধরে তিনটে লোক এগোতে লাগল সামনের দিকে।

সোজা রাস্তা ধরতে গেলে নেইই। চোখ-বাঁধা অবস্থায় উঁচু-নিচু পথ ভাঙতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল খুব। টাবলু হঠাৎ পকেট থেকে কমলা-লেবু বার করে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে জয় আর শংকরকে বলল, "কমলালেবু আছে না তোদের কাছে?"

"আছে।"

"খা।"

"আমার খেতে ইচ্ছে করছে না," উত্তর দিল জয়।

"ইচ্ছে না হলেও খা।"

"কেন?" প্রশ্ন করল শংকর।

"কেন আবার, এমনি। সবগুলো খাবি, একটাও রাখিস না।"

টাবলুর বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, ওরা আর প্রতিবাদ করতে পারল না। পকেট থেকে কমলালেবু বার করল দুজনেই।

বহুক্ষণ ধরে চড়াই-উতরাই ভেঙে-ভেঙে ক্লান্ত হয়ে ওরা সমতলে এসে পৌঁছল। সোজা পথে কিছুটা হাঁটার পরে লোকগুলো ওদের চোখের বাঁধন খুলে দিল। কিন্তু, ওরা তক্ষুনি-তক্ষুনি তাকাতে পারল না, বাইরের আলোয় জ্বালা ধরে গেল চোখে। কিছুক্ষণ চোখ রগড়াবার পরে ওরা আস্তে-আস্তে সবকিছু দেখতে পেল আবার।

সামনে লম্বা পিচের রাস্তা। রাস্তার ওপরে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে। একটা ছোট, আর একটা বেশ বড়। ছোট গাড়িটায় হেলান দিয়ে

দাঁড়িয়ে আছে সাহেব। পালবাবু বড় গাড়িটার দরজা খুলে টাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "উঠে পড় চটপট।" ওরা উঠে পড়ল। সঙ্গের লোকগুলো মুহূর্তের মধ্যে মালপত্র তুলে গাড়িতে উঠে বসতেই গাড়ি-দুটো ছুটতে লাগল শাঁ-শাঁ করে।

টাবলু জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চারদিক দেখছিল। পালবাবু বলল, "বাইরে তাকিও না। সিটে বসে থাক চুপ করে।" টাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে যেমন দেখছিল সেইভাবেই দেখতে লাগল। পালবাবু হঠাৎ ড্রাইভারকে কী যেন বলতেই ড্রাইভার ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামিয়ে দিল।

পালবাবু গম্ভীর গলায় টাবলুদের বলল, "যাও, তোমরা ভেতরে গিয়ে বোসো।"

গাড়িটা অনেকটা ভ্যানের মতো দেখতে। পেছনে লম্বা-লম্বা সিট, কিন্তু একটাও জানলা নেই। ওরা সেখানে বসতেই পালবাবু একটা ফ্লাস্ক খুলে তিন গ্লাস দুধ ঢেলে ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে খুব নরম গলায় বলল, "দুধটা খেয়ে নাও। গাড়ি একটানা অনেকক্ষণ চলবে, না খেলে কষ্ট পাবে।"

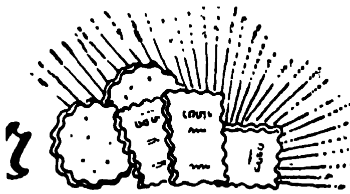
টাবলু রাগের ভঙ্গিতে উত্তর দিল, "আমরা ছেলেমানুষ নই। দুধ খাই না।"

পালবাবু কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল, তারপর আরও নরম গলায় বলল, "কে বলল ছেলেমানুষরাই শুধু দুধ খায়? বড়রাও খায়। তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে আমরাও খাব। নাও, শিগ্‌গির খেয়ে নাও।"

টাবলু একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিয়ে চোঁ করে দুধটা খেয়ে ফেলল। দেখাদেখি জয় আর শংকরও খেল।

পালবাবু মুচকি হেসে ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করল, নিজেরা আর খেল না। গাড়ি আবার ছুটতে লাগল শাঁ-শাঁ করে।

একটু পরেই টাবলু, জয় আর শংকরের প্রচণ্ড ঘুম পেয়ে গেল। এত ঘুম যে চোখের পাতা টেনে রেখেও ওরা জেগে থাকতে পারছিল না। এখন তো সবে সন্ধে, এত ঘুম তো ওদের পাবার কথা নয়! এক এক করে তিনজনেই লম্বা সিটের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।



সবার আগে ঘুম ভাঙল শংকরের। চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। চারদিকের কিছুই ও চিনতে পারল না। াড়িতে ঘুমিয়ে পড়ার কথা মনে পড়তেই ও লাফিয়ে উঠে টাবলু আর য়কে তুলে দিল। টাবলু আর জয় ওর দুপাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। ারদিকে তাকিয়ে ওরাও চমকে গেল ভীষণ। ছিল গাড়িতে, ঘরের ধ্যে এল কখন!

ঘরটা সাজানো-গোছানো, কাচের জানলা দিয়ে একটু দূরের াহাড় দেখা যাচ্ছে। টাবলু প্রায় ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুলতে গেল, ারল না, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। ঘটনাটার মাথামুণ্ডু কিছুই ঝতে পারল না ওরা। এখন সকাল আটটা, কাল সন্ধেবেলায় ঘুমো-ার পরে এত কাণ্ড ঘটে গেছে! ঘুমোবার পরে কেউই আর জাগেনি, ার মানে ঘুমন্ত অবস্থায় ওদের ঘরে তুলে আনা হয়েছে। এ-ঘরটা রা জীবনে দেখেনি, জানলা দিয়ে বাইরের যা-কিছু দেখা যাচ্ছে সবই পরিচিত। ওরা তাহলে এখন কোথায়! কী উদ্দেশ্যেই বা ওদের খানে নিয়ে আসা হয়েছে?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টাবলু বলল, "আমাদের এখানে য়ে আসা হবে বলেই কাল দুধ খাওয়ানো হয়েছিল।"

"দুধ?"

"হ্যাঁ, দুধের মধ্যে নির্ঘাত ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল।"

"ঘুমের ওষুধ!"

"ওষুধ না খাওয়ালে আমরা কেউই এভাবে ঘুমোতাম না।"

শংকর কী যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দরজা খুলে গেল খুট করে। পালবাবু। পালবাবু হাসি-হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করল, "কী, ঘুম ভাঙল?"

টাবলু ওর কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, "আমাদের কোথায় আনা হয়েছে?"

"কোথায় মানে?"

"মানে, এ-জায়গাটার নাম কী?"

"ওহো, সেটাও তোমরা জানতে পারোনি। এটাই তো নেপাল।"

"নেপাল!"

শুনে টাবলু বিস্মিত হল, কিন্তু জয় আর শংকরের মুখ ঝলমল করে উঠল। টাবলু বলল, "নেপালে যখন এসেছি, তখন আর আমাদের আটকে রাখছেন কেন? ছেড়ে দিন এবার।"

পালবাবু হ্যা-হ্যা করে হেসে বলল, "কে বলল আটকে রেখেছি! হাত মুখ ধোও, খাওয়া-দাওয়া করো, তারপর তো যাবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।"

বলে পালবাবু চলে গেল। লোকটাকে জয় আর শংকরের এখন আর খুব একটা খারাপ লাগছিল না। লোকটা ওদের সঙ্গে বাজে ব্যবহার করেছিল সত্যি, তবে এখন মনে হয়, ও ওর ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু টাবলুদার মুখ এত গম্ভীর কেন?

আধঘণ্টার মধ্যে ওরা জামাকাপড় পরে তৈরি হয়ে নিল। তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল পালবাবু, ওর পেছন-পেছন একটা লোক, লোকটার হাতে মস্ত একটা প্যাকেট। প্যাকেট খুলে পাল-

বাবু তিনটে চমৎকার কোট তিনজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও, পরে নাও। দেখ তো কেমন হয়েছে?"

টাবলু বলল, "আপনাদের কোট আমরা নেব কেন?"

"আরে বাবা, এগুলো আমাদের নয়, তোমাদের।"

"আমাদের!"

"হ্যাঁ তোমাদের। কাল যা ঘুমোচ্ছিলে, তাই ঘুমের মধ্যেই দর্জি মাপ নিয়ে গিয়েছিল, আর্জেণ্ট অর্ডার।"

"আমাদের জন্যে হঠাৎ কোট বানাতে গেলেন কেন?"

"আমি বানাতে বলিনি।"

"কে বলেছে?"

"সাহেব। সাহেব আমাদের বস্। সাহেবের খুব ভাল লেগে গেছে তোমাদের। ভালবেসে কেউ দিলে নিতে হয়। নাও, তাড়াতাড়ি পরে নাও।"

টাবলু একটু ইতস্তত করে কোটটা গায়ে চাপাল। ওকে পরতে দেখে জয় আর শংকরও পরল। কোটগুলো কী সুন্দর দেখতে আর কী চমৎকার ফিটিংস। শংকরের ভীষণ ইচ্ছে করছিল ওদিকের আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু লজ্জা করছিল বলে যেতে পারল না। জয়েরও লজ্জা করছিল, তবে তার কারণ অন্য। কোটটা গায়ে দিয়ে ওর ভীষণ ভারী-ভারী ঠেকছিল। রোগা-পটকা বলে ওর মনে মনে দুঃখ আছে খুব, এখন যদি বলে কোটটা ভীষণ ভারী, তাহলে এক্ষুনি সবাই ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।

ঘরের লাগোয়া আর একটা ঘর। সেই ঘরে ঢুকতেই দেখে টেবিলে খাবার সাজানো। লোকটা ওদের বসতে বলে নিজেও একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। ডবল ডিমের পোচ, টোস্ট আর

কর্নফ্লেকস। কাল রাত্রে দুধ ছাড়া আর কিছুই খাওয়া হয়নি, একবার বলতেই ওরা তিনজনে খেতে শুরু করে দিল।

খাওয়া হয়ে গেলে চা এল, চা খেতে-খেতে লোকটা বলল, "শোনো, হঠাৎ একটা জরুরী দরকার পড়ে গেছে, এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে। তোমরাও চলো আমার সঙ্গে। ফিরে এসে তোমাদের ছোটমামার বাড়িতে পৌঁছে দেব।"

টাবলু বলল, "পৌঁছে দেবার দরকার নেই, আমরা নিজেরাই চিনে যেতে পারব। আপনি আপনার কাজে যান, আমরা চলে যাই।"

"তাই কখনও হয় নাকি, অচেনা-অজানা জায়গা, কোত্থেকে কী হয়!"

"না, কোনো অসুবিধে হবে না। আমরা ঠিক চিনে যেতে পারব।"

"তা ঠিক। কিন্তু সাহেব যে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে চান।"

"কেন?"

"কেন আবার, এমনি। তোমাদের ভাল লেগে গেছে তাই।"

"কোথায় আছেন সাহেব?"

"যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই।"

"কদ্দূর?"

"বেশি দূর নয়। ওখান থেকে তোমাদের ছোটমামার বাড়িও কাছে হবে।"

বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে, তারপর কোট উপহার দেবার ফলে ওই সাহেবের ওপর জয় আর শংকরের বেশ দুর্বলতা এসে গেছে। সাহেব খুব ভাল, ওদের জন্যে এত করলেন, আর ওরা তাঁর সঙ্গে একটু

দেখাও করবে না ? শংকর হঠাৎ ওদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ে বলল, “টাবলুদা, চল না একটু দেখা করেই আসি।”

পালবাবু হেসে বলল, “বাহ্, এই তো গুড বয়ের মতো কথা।”

টাবলুর মুখ দেখেই বোঝা গেল, হঠাৎ আগ বাড়িয়ে এভাবে কথা বলার জন্যে শংকরের ওপর মনে মনে ও চটে গেছে খুব। কিন্তু রাগ না দেখিয়ে ও গম্ভীরভাবে পালবাবুকে বলল, “ঠিক আছে, চলুন।”

রাস্তায় বেরিয়ে পালবাবু বললেন, “আর একটা দরকারি কথা, আমরা বাসে চেপে যাব, বাসের মধ্যে তোমরা কিন্তু আমার সঙ্গে একটাও কথা বলবে না। এমনভাবে যাবে যেন তোমাদের সঙ্গে আর কেউ নেই। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে তাহলেও বলবে না। বলবে, তোমরা তিনজনে নেপালে বেড়াতে এসেছিলে, এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছ।”

টাবলু বলল, “কিন্তু আমরা তো বাড়ি ফিরে যাচ্ছি না, আর নেপালও আমাদের দেখা হয়নি।”

“আরে বাবা এটুকু বানিয়ে বলতে পারবে না ? না বললে···।”

“না বললে ?”

“না বললে আমরা সবাই বিপদে পড়ব।”

“কেন ?”

“পরে বলব। আর এই নাও তোমাদের সতুদার চিঠি, কাস্টমসের লোকেরা দেখতে চাইলে দেখিয়ে দিও।”

“কাস্টমস কেন ? আমরা কি সত্যি সত্যিই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি ?”

“আরে বাবা, বাড়িই যদি ফিরে যাবে তাহলে তোমাদের আর নেপালে আনা হল কেন ? ইণ্ডিয়া বর্ডারে আমার একটু দরকার আছে, সাহেবও আছেন ওখানে, পাঁচ মিনিট কথা বলবে, তারপর

আমরা সোজা তোমাদের ছোটমামার বাড়িতে চলে যাব। ওখান থেকে একটা শর্ট কাট রাস্তা আছে।”

লোকটার কথা শুনে টাবলু আরও গম্ভীর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ হাঁটার পরে দেখা গেল, দূরে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা বলল, “ওই বাসটায় উঠবে। এই নাও তোমাদের বাসের টিকিট, এই টাকাগুলোও রাখ তোমাদের সঙ্গে।”

“টাকা কেন?” জিজ্ঞেস করল টাবলু।

লোকটা একটু হেসে বলল, “রাস্তায় কিছু খেতে-টেতে ইচ্ছে করলে খাবে।”

টাবলু টিকিট তিনটে লোকটার হাত থেকে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, “টাকা রেখে দিন, লাগবে না।”

টাকা নেবার জন্যে লোকটা আরও কয়েকবার সাধাসাধি করল, কিন্তু টাবলু নিল না। লোকটা তখন টাকাগুলো পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলল, “তাহলে আর দেরি কোরো না, যাও, বাসে গিয়ে উঠে পড়, আমি আসছি পেছন-পেছন। মনে থাকে যেন, বাসের মধ্যে তোমরা আমাকে চেনো না।”

মাথা নেড়ে ওরা বাসের দিকে হাঁটতে লাগল। জয় একবার পেছন ফিরে দেখল, লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

রাস্তাটা খুব একটা চওড়া নয়, কিন্তু বেশ পরিষ্কার, গর্ত-টর্ত নেই কোথাও। ডানদিকে পাহাড়, বাঁ দিকে সামান্য নিচু খাদ। খাদের ওপাশে প্যাগোডার মতো বাড়ি, ওখান থেকেই বোধ হয় ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে।

বাসের কনডাকটরকে টিকিট দেখাতেই লোকটা ওদের বসার জায়গা দেখিয়ে দিল। ড্রাইভারের পেছনে পাশাপাশি তিনটে সিট

ওদের। বাসটা যাত্রীতে বোঝাই হয়ে গেছে প্রায়। শংকর মুখ ঘুরিয়ে যাত্রীদের দেখতে-দেখতে হঠাৎ চমকে উঠল। ওই লোকদুটো না? হ্যাঁ, ওই লোকদুটোই তো কাল ঘরের মধ্যে ওদের পাহারা দিচ্ছিল। টাবলু আর জয়কে বলতেই ওরাও লোকদুটোকে দেখল। টাবলু কোনো মন্তব্য করল না। জয় বলল, "মনে হচ্ছে ওরাই, কিন্তু···।"

একটু পরেই ড্রাইভার কয়েকবার হর্ন বাজিয়ে বাস ছেড়ে দিল। কিন্তু পালবাবু কোথায়? ওরা তিনজনে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখল, ওদের ঠিক পেছনের সিটে পালবাবু গম্ভীর হয়ে বসে আছে। কখন এসে বসেছে, ওরা কেউই দেখতে পায়নি।

বাস স্টার্ট নিয়েই টেনে ছুটতে লাগল। রাস্তায় লোকজন বিশেষ নেই। জানলা দিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে গায়ে, মিষ্টি রোদ্দুর। জয় পকেট থেকে চকোলেট বার করে শংকর আর টাবলুকে দিয়ে নিজে একটা মুখে পুরে দিল।

আধ-ঘন্টাটাক ছোটার পরে বাসটা একটা কাঠের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়াতেই বাসের দরজা খুলে খাকি-জামা-পরা দুটো লোক উঠে এল ভেতরে। রুটুং যাবার পথে বাসে চেকিং হয়েছিল। লোকদুটোকে দেখেই জয় আর শংকর বুঝতে পারল যে, এরা কাস্টমসের লোক। লোকদুটো বাসের মালপত্তর আর যাত্রীদের চেক করে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের একবার দেখে নিয়ে ব্যাগ তিনটে ওপর-ওপর একটু টিপে নেমে গেল বাস থেকে। ওরা নেমে যাবার পরে বাস আবার ছুটতে লাগল সামনের দিকে।

এবার সোজা রাস্তা কম। খালি বাঁক আর বাঁক। ড্রাইভার অনবরত স্টিয়ারিং ডানদিকে বাঁদিকে ঘোরাচ্ছে। এত বাঁক যে মাথা ঝিমঝিম করছিল জয় আর শংকরের।

ঘণ্টাদেড়েক পরে আবার একটা চেক পোস্ট এল। এবার কাস্টমসের লোকেরা প্রথমেই এল টাবলুদের কাছে। একজন অফিসার গোছের লোক ওদের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, "তোমরা কোত্থেকে আসছ ?"

টাবলু কোনো উত্তর না দিয়ে পকেট থেকে সতুদার লেখা চিঠিটা বার করে এগিয়ে দিল। চিঠিটা পড়ে অফিসার চলে যাচ্ছিল, টাবলু হঠাৎ বলল, "আমি একটু নীচে নামতে পারি ?" অফিসার বলল, "ও, ইয়েস।"

টাবলু নেমে গিয়ে ওদিকের ছোট্ট একটা খাবারের দোকানের সামনে দাঁড়াল। মিনিট পাঁচেক পরে শালপাতার ঠোঙায় খাবার নিয়ে ফিরে এল। খাবার দেখে জয় আর শংকর খুশি হয়ে ঠোঙায় হাত দিতেই টাবলু ফিসফিস করে বলল, "পচা খাবার, খাস না। হাতে নিয়ে খাওয়ার ভান কর, তারপর লুকিয়ে-লুকিয়ে জানলা দিয়ে ফেলে দিবি।"

টাবলুর কথা শুনে জয় আর শংকর অবাক হয়ে গেল। শংকর বলল, "পচা খাবার যখন, কিনলি কেন ?"

টাবলু গলা আরও নামিয়ে বলল, "আমি তো সত্যি-সত্যি খাবার কিনতে যাইনি, খবর আনতে গিয়েছিলাম, খবর পেয়েছি।"

"কী খবর ?"

"পরে বলব।"

চেকিং হয়ে গেলে বাস আবার দৌড়তে লাগল। বাসের গোঁ-গোঁ শব্দ আর থথর কাঁপুনির মধ্যে টাবলু খুব নিচু গলায় জয় আর শংকরকে বলল, "ঘণ্টাখানেক পরে আর একটা চেক পোস্ট আসবে, ওটাই নেপালের শেষ চেক পোস্ট, চেক পোস্টে আমি যা করব,

তোরাও তাই করবি, ক্যাবলার মতো বসে থাকিস না।”

কেন? কী ব্যাপার?—এ-সব প্রশ্ন তুলল না জয় আর শংকর। টাবলুদার থমথমে মুখ দেখেই ওরা বুঝতে পেরেছে যে, ও এখন এ-নিয়ে আর একটা কথাও বলবে না। খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হচ্ছিল না ওদের, কারণ ঠিক পেছনের সীটেই বসে আছে ওই লোকটা। বাস যত এগোচ্ছিল, জয় আর শংকরের কৌতূহল, উত্তেজনা আর উদ্বেগ বেড়ে যাচ্ছিল তত।

চেক পোস্টের সামনে এসে বাসটা থেমে গেল। কিন্তু, কই, টাবলুদা তো কিছুই করছে না। ওর মুখটা অসম্ভব গম্ভীর আর লালচে হয়ে উঠেছে। কাস্টমসের চারজন লোক উঠে পড়েছে বাসে। দুজন চেক করছে বাসের পেছনে, আর দুজন সামনে। চারজনই মনে হয় নেপালী। একটা লোক চেক করতে করতে ওদের সামনে আসতেই টাবলু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার পেটে টেনে এক ঘুষি মারল। লোকটা উফ্ করে বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বাসের মধ্যে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড হৈ-চৈ। কাস্টমসের বাকি তিনটে লোক ছুটে এল ওদের কাছে। আসতেই টাবলু ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুষি চালাতে লাগল। কিন্তু, একা তিনজনের সঙ্গে পারবে কী করে? ওরা ধরে ফেলল টাবলুকে।

পুরো ঘটনাটা এতই আকস্মিক যে জয় আর শংকর পাথরের মতো হয়ে গিয়েছিল। ওই লোকগুলো যখন টাবলুকে টেনে-হিঁচড়ে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ জয় আর শংকরের টাবলুর শেষ কথাটা মনে পড়ে গেল, “আমি যা করব, তোরাও তাই করবি।” মনে পড়তেই ওরা লাফিয়ে পড়ল ওই লোকগুলোর ওপর। শংকর টাবলুকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, আর যে লোকটা টাবলুর

হাত ধরেছিল, জয় তার হাতে কামড়ে দিল জোরসে। লোকটা আহ্ বলে এক ঝটকা মারতেই জয় ছিটকে পড়ল বাসের দরজার ওপর। ওর মাথাটা দরজায় ঠুকে গেল ঠকাস করে।

জয় আর শংকরকেও ধরে ফেলল কাস্টমসের লোকেরা। তারপর ওদের তিনজনকেই টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল। একটু দূরে একটা বাড়ি, বাড়ির সামনে দুজন পুলিশ রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেইদিকেই টাবলুদের নিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

পালবাবু হঠাৎ ছুটে এসে পাহাড়ী ভাষায় কাস্টমসের লোকদের কী-সব বলতে শুরু করে দিল। পালবাবুকে দেখে টাবলু চেঁচিয়ে উঠল, "ধরুন, অ্যারেস্ট হিম।" লোকগুলো টাবলুর কথাকে পাত্তাই দিল না। টানতে টানতে ওদের নিয়ে চলল ওই বাড়িটার দিকে।

জয় আর শংকর পেছন ফিরে পালবাবুকে আর দেখতে পেল না। বাড়িটায় ঢুকতেই একটা বড় ঘর। ঘরে একজন হোমরা-চোমরা পুলিশ অফিসার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে বসে। কাস্টমসের লোকগুলো অফিসারকে উত্তেজিত হয়ে কী-যেন বলতেই অফিসার চোখ পাকিয়ে টাবলুদের দিকে তাকিয়ে গরগর করে বলল, "য়্যু লিটল রাফিয়ান্স, আইল মেণ্ড য়্যু।"

টাবলু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "জাস্ট এ মিনিট।" বলেই ওর গায়ের কোটটা খুলে ফেলল, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বার করল নেল কাটার। নেল কাটারের সঙ্গে লাগানো একটা ছোট্ট ছুরি। কোটটা টেবিলের ওপর পেতে টাবলু ওই ছুরি দিয়ে কোটের কলার চিরে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চকচকে বিস্কুটের মতো কয়েকটা জিনিস ঠকঠক করে পড়ল টেবিলের ওপর। ওগুলো দেখেই চমকে লাফিয়ে উঠে অফিসার বলল, "গোল্ড বিস্কিট!"



সোনার বিস্কুট দেখে কাস্টমসের লোকগুলো অবাক হয়ে গেল। জয় আর শংকরও থ।

টাবলু দু-চার কথায় অফিসারকে ঘটনাটা জানিয়ে বলল, "আগে ওই লোকটাকে ধরুন, পরে সব খুলে বলব।" শোনার সঙ্গে-সঙ্গেই অফিসার কোমর থেকে পিস্তল বার করে ইঙ্গিতে ওদের সঙ্গে আসতে বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। রাস্তায় নেমেও ছুট।

বাসে পালবাবুকে পাওয়া গেল না, ওই দুটো পাহাড়ী লোকও উধাও। ধারে কাছে কোথাও নেই। একটু আগেও তো ছিল, এর মধ্যে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল! অফিসার বলল, "যাবে কোথায়, ঠিক ধরে ফেলব। লোকগুলোর আইডেনটিফিকেশন মার্ক বলো। দেখতে কেমন? কী ধরনের জামাকাপড় পরে আছে?"

টাবলু খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব বলতে লাগল। অফিসার মনোযোগ দিয়ে শুনতে-শুনতে ফিরে এলেন তাঁর টেবিলে। টাবলু যখন পালবাবু আর ওই পাহাড়ী লোকদুটোর জামা-কাপড়ের বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন জয় উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওরা কিন্তু ছদ্মবেশ ধরতে পারে।"

অফিসার জয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়াট বেশ?"

শুনে জয় খুব বিব্রত হয়ে দুবার বলল, "ছদ্মবেশ, ছদ্মবেশ।"

কিন্তু অবাঙালী অফিসারের মুখ দেখে বোঝা গেল উনি শব্দটার মানে ধরতে পারেননি। জয় তখন ফিসফিস করে টাবলুকে জিজ্ঞেস করল, "এই টাবলুদা, ছদ্মবেশের ইংরেজি কী রে?"

টাবলু একটু হেসে ফেলে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল অফিসারকে। অফিসার মোটামুটি কাজ চালাবার মতো বাংলা জানেন। টাবলু ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে কথা বলছিল অফিসারের সঙ্গে।

সব শুনে অফিসার পরপর চারটে ফোন করে টাবলুকে বললেন, "এই এলাকা থেকে বেরোবার সব কটা রাস্তায় পাহারা বসে যাচ্ছে এক্ষুনি। ঠিক ধরে ফেলব লোকগুলোকে।"

জয় আর শংকরের কোটের কলার কাটতেও অনেকগুলো সোনার বিস্কুট বেরিয়ে পড়ল। অফিসার বিস্কুটগুলোকে থাক-থাক করে সাজিয়ে রাখলেন টেবিলের ওপর। চকচকে বিস্কুটগুলোর গা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল।

সোনার বিস্কুটের ছোট্ট পাহাড়ের সামনে বসে টাবলু, জয় আর শংকর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা অফিসারকে বলল। শুনতে শুনতে অফিসার কী সব নোট করলেন, তারপর বললেন, "আচ্ছা, কাল বিকেলবেলায় তোমাদের যেখান থেকে গাড়িতে তোলা হয়েছিল, সেই জায়গাটার নাম জানতে পেরেছ কেউ?"

টাবলু বলল, "জায়গাটার নাম মনে হয় থাংপা।"

"কী করে জানলে?"

আমাদের গাড়িতে তোলার পরে আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রেখেছিলাম। গাড়ি কিছুটা যাবার পরে একটা পেট্রল পাম্প পড়েছিল। সাইন বোর্ডে ঠিকানার জায়গায় লেখা ছিল থাংপা।"

অফিসার উত্তেজিত হয়ে বললেন, "গুড। আমরা এক্ষুনি ওখানে যাব। ওদের হাইড-আউট, মানে যেখানে তোমাদের আটকে রেখেছিল, সেই জায়গাটা চিনতে পারবে?"

টাবলু উত্তর দিল, "বোধহয় পারব।"

অফিসার বললেন, "বাই দি ওয়ে, তোমার ছোটমামার ফোন নাম্বারটা দাও। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি, বিকেলের দিকে তিনি এখানে চলে আসবেন। বাই দিস টাইম···নাউ, রাশ।"

মিনিট তিনেকের মধ্যে পুলিশ-বোঝাই দুটো জীপ ছুটতে লাগল থাংপার দিকে। প্রথম জীপে সামনের সিটে পুলিশ অফিসার আর টাবলুরা। অফিসার নিজেই জীপ চালাচ্ছিলেন। জীপ দুটো ছুটছিল ঝড়ের মতো।

ঘণ্টা আড়াই এক নাগাড়ে জীপ ছুটে থাংপা পেট্রল পাম্পের সামনে এসে দাঁড়াল। টাবলু বলল, "এবার সোজা চলুন, আস্তে আস্তে।" আরও কিছুটা জীপ এগোবার পরে টাবলু বলল, "ওই তো সেই তিনটে গায়ে-গায়ে লাগানো গাছ, এখানে, এখানেই থামুন।" গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশরা টকাটক লাফ মেরে নেমে পড়ল রাস্তায়। টাবলুরাও নামল।

রাস্তার দুদিকেই ঠিক একই ধরনের মাঠ। টাবলু ডানদিকের রাস্তায় নেমে পড়ল। ওর পাশে অফিসার, জয় আর শংকর, পেছন-পেছন পুলিশরা। মাঠটা সোজা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। জঙ্গলের সামনে থমকে দাঁড়াল টাবলু। এই পর্যন্ত ওর দিব্যি মনে আছে, কিন্তু বাকি পথটা তো ওদের চোখ বেঁধে আনা হয়েছিল। টাবলু প্রথমে ডানদিকে গেল, কিছুটা যাবার পরে ফিরে এল। ফিরে এসে সোজা হাঁটতে লাগল, কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটার পরে ফিরে এল আবার। এবার বাঁ দিকে, বাঁ-দিকের পথটা ভীষণ উঁচু-নিচু। ওই পথ ধরে কিছুটা যাবার পরে টাবলু হঠাৎ ছুটে গিয়ে কী যেন একটা কুড়িয়ে নিয়ে জ্বলজ্বলে মুখ করে বলল, "হ্যাঁ, এই দিকেই আসুন।"

টাবলুর হাতে এক টুকরো কমলা লেবুর খোসা। খোসাটা দেখেই জয় আর শংকর বুঝতে পারল, কেন ওদের চোখ বেঁধে নিয়ে আসার সময় টাবলুদা কমলালেবুগুলো খেতে বলেছিল। রাস্তায় পড়ে-থাকা কমলালেবুর খোসাগুলো পথ চেনার চিহ্ন।

কমলালেবুর খোসা দেখে দেখে উঁচু-নিচু ঘোরানো পথ ধরে ওরা এক সময় গুহাটার সামনে এসে হাজির হল। অফিসার ইঙ্গিত করতেই পুলিশরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল গুহাটা। গুহার দরজা খোলার কায়দাটা টাবলু আগেই দেখে রেখেছিল। বোতাম টিপতেই ঘর্ঘর শব্দ তুলে খুলে গেল দরজা। কিন্তু, ঘরের মধ্যে তো কেউ নেই, পাশের ঘরটাও ফাঁকা। অফিসার দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "খবর পেয়ে গেছে মনে হয়, সব কটা পালিয়েছে।"

কিন্তু, এখানে আর একটা ঘর আছে, সেই ঘরটা গেল কোথায়! ঘুলঘুলি দিয়ে পালাবার সময় ঘরটা দেখতে পেয়েছিল টাবলু। ঘরে ছিল প্যাকিং বাক্স আর ঝুড়ি। টাবলুর কথামতো একজন ঘুলঘুলিতে উঠে উঁকি মেরে দেখল, হ্যাঁ, সত্যিই ঘর আছে। ঘর আছে অথচ দরজা নেই, এমন তো হতে পারে না!

এই ঘরের মধ্যে একটা কাঠের আলমারি আছে, আলমারিতে কিছু নেই। আলমারির ভেতরের দেয়ালটা অফিসার লাঠি দিয়ে ঠুকে বললেন, "এটা পাথর নয় কাঠ, কাঠটা খুলে ফেল।" কাঠটা খুলতেই ছোট্ট একটা দরজা বেরিয়ে পড়ল।

হাতে পিস্তল নিয়ে সবার আগে ওই ঘরে ঢুকলেন অফিসার, পেছন-পেছন বাকি সবাই। এ ঘরেও কেউ নেই, শুধু কতগুলো কাঠের বাক্স আর ঝুড়ি আছে। বাক্সের ডালা খুলে দেখা গেল চায়ের পাতা। ঝুড়ির মধ্যে কমলালেবু। অফিসার গম্ভীরভাবে চায়ের পাতা আর কমলালেবু পরীক্ষা করে হুকুম দিলেন, ঝুড়ি-বাক্সগুলো উলটে দাও।

একটা চায়ের বাক্স মেঝেতে উপুড় করে দিতেই কী যেন চিকচিক করে উঠল চায়ের মধ্যে। হাতে নিয়ে দেখা গেল, ওগুলো সোনার

বিস্কুট। কমলালেবুর ঝুড়ি ওলটাতেই বেরিয়ে এল ক্যামেরা আর ঘড়ি। কোনো বাক্সেই শুধু চা নেই, কোনো ঝুড়িতেই শুধু কমলালেবু নেই। দেখতে দেখতে একটা খালি চায়ের বাক্সের অর্ধেক ভরে গেল চোরাই ঘড়ি, ক্যামেরা আর সোনার বিস্কুটে। উত্তেজনায় কারও মুখে কোনো কথা নেই, অত শীতের মধ্যেও অফিসারের কপাল ভিজে গেছে ঘামে। বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেছে টাবলু, জয় আর শংকর। ওরা নিজেদের চোখগুলোকেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিল না।

অফিসার ওই গুহায় চারজন পুলিশকে লুকিয়ে থাকতে বললেন। চোরাকারবারীরা যদি আসে, ধরবে। হাতঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে অফিসার টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলো এবার আমরা যাই।"

একজন পুলিশ ঘড়ি-ক্যামেরা-সোনার বিস্কুটের বাক্সটা মাথায় তুলে নিল। তারপর, চারজন বাদে বাকি সবাই বেরিয়ে পড়ল গুহা থেকে।

এতক্ষণ সময় যে কী ভাবে কেটে গেল, কেউই ঠিক বুঝতে পারছিল না। খালি উত্তেজনা, উত্তেজনা আর উত্তেজনা। ওরা যখন আবার চেক পোস্টে পৌঁছল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অফিসারের ঘরে ঢুকতেই টাবলু দেখল ছোটমামা বসে আছেন। ছোটমামা ওকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। ছোটমামার চোখমুখ দেখলেই বোঝা যায় এতক্ষণ ধরে উনি ভীষণ চিন্তা করছিলেন। ছোটমামা বললেন, "যা খুশি কর তোরা, কিন্তু বাড়ির লোকদের একটা খবর তো দিবি। বাড়ির লোকেরা দুশ্চিন্তায় ছটফট করছে।"

টাবলু লাজুক মুখে কী যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই অফিসার ছোটমামাকে বললেন, "বকবেন না ওদের! ওরা যা করেছে

তার তুলনা নেই। গত দশ বছরের মধ্যে এত বড় চোরাচালান আমরা ধরতে পারিনি। বসুন, সব বলছি, কফি খান।"

ছোটমামা একটু হেসে বসলেন, তারপর টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "একটু আগে এখান থেকেই ট্রাঙ্ক কলে বাড়ির লোকদের জানিয়ে দিয়েছি যে, মূর্তিমানরা সব বহাল তবিয়তে আছে। কাল সকালের ফ্লাইটেই তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব।"

টাবলু বলল, "কক্ষনো না। বাড়ির লোকেরা যখন খবর পেয়ে গেছে তখন আর অত তাড়াহুড়োর কী আছে। নেপাল এসে নেপাল না দেখে গেলে লোকে বলবে কী!"

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে লাগিয়ে কী শুনে প্রচণ্ড খুশি হয়ে উঠলেন অফিসার। পাহাড়ী ভাষায় কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে টাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গ্যাট পল্ হ্যাজ বীন অ্যারেস্টেড।"

কথা শেষ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে অফিসার বললেন, "ধরা পড়ে গেছে লোকটা, এখানে নিয়ে আসতে বলে দিয়েছি, এক্ষুনি এসে যাবে।"

একটু পরেই সবার জন্যে কফি আর গরম গরম পকৌড়া এসে গেল। কফি খেতে খেতে অফিসার টাবলুদের অ্যাডভেঞ্চারের গল্প রসিয়ে রসিয়ে শোনাতে লাগলেন ছোটমামাকে। গল্পও শেষ হল আর অমনি টাবলুদের পেছনে খটাশ খটাশ করে ভারী বুটের শব্দ উঠল। সবাই তাকিয়ে দেখে দুজন কনস্টেবলের সঙ্গে পালবাবু। পালবাবুর হাতে হাতকড়া, কোমরে দড়ি। পালবাবু হিংস্র চোখে টাবলুর দিকে তাকাতেই টাবলু ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলল, "কী পালবাবু, চিনতে পারছেন?"

পালবাবুর চোয়ালদুটো অনবরত ওঠানামা করছিল, চাপা গলায় উত্তর দিল, "তোমাদের আমি প্রথমদিনই চিনতে পেরেছিলাম, সেই জন্যেই শেষ করে দিতে চেয়েছিলাম একেবারে, তা না, সাহেবের মাথায় বুদ্ধি খেলল, তোমাদের দিয়ে কাজ হাসিল করাবে। এখন বোঝো ঠ্যালা!" পালবাবু কথাগুলো এমনভাবে বলল যেন ও নয়, সাহেবই ধরা পড়েছে।

অফিসার গম্ভীরভাবে বললেন, একে এখন লক-আপে ঢোকাও। পালবাবুকে কনস্টেবলরা লক-আপে নিয়ে গেল। ছোটমামা বললেন, "তাহলে এখন আমরা চলি। অনেক দূর যেতে হবে।"

অফিসার "ও কে" বলে হ্যাণ্ডশেক করলেন ছোটমামার সঙ্গে, তারপর টাবলুদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। এক-এক করে টাবলু, জয় আর শংকর তিনজনেই হ্যাণ্ডশেক করল অফিসারের সঙ্গে।

ছোটমামার সঙ্গে গাড়ি ছিল। ড্রাইভারের পাশে বসল ছোট-মামা, পেছনের সিটে টাবলুরা। গাড়ি ছুটতেই শংকর ফিসফিস করে বলল, "আচ্ছা টাবলুদা, তুই হঠাৎ কাস্টমসের লোকদের মারতে গেলি কেন?"

"ধরা পড়ার জন্যে," উত্তর দিল টাবলু।

"কিন্তু ওভাবে ধরা না পড়ে আমরা তো সোজা কাস্টমসের লোকদের আসল কথাটা বলতে পারতাম।"

"তা পারতাম। কিন্তু ওদের যদি ঠিকমতো বোঝাতে না পারতাম। তাছাড়া পাল লোকটা ঠিক পেছনেই বসে ছিল, ও আবার নতুন কী চাল চালত কে জানে। লোকটার পকেটে আমি পিস্তলও দেখেছিলাম।"

"আচ্ছা, কোটের কলারে সোনার বিস্কুট আছে কী করে বুঝলি?"

"অত খাতির করে কোট উপহার দিতেই সন্দেহ হয়েছিল। সন্দেহ আরও বাড়ল কোটটা ভীষণ ভারী দেখে। কোটের কলার টিপে দেখলাম, প্যাডের বদলে অন্য কিছু আছে। তবে ওগুলো সোনার বিস্কুট বলে বুঝতে পারিনি। কাস্টমস, বর্ডার, বাসে কথা-না-বলা, এইসব শুনে আমার সন্দেহ পাকা হয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম কোটের মধ্যে চোরাই মাল আছে।"

"খাবারের দোকানদারের কাছে কী খবর আনতে গিয়েছিলি তখন ?"

"আর কটা চেক পোস্ট আছে। চেক পোস্টগুলো পেরিয়ে গেলে আমাদের কিছু করার থাকত না। কাজ উদ্ধারের পরে ওদের গুহা দেখে ফেলার দোষে লোকগুলো নির্ঘাত মেরে ফেলত আমাদের।"

শুনে কেঁপে উঠল জয় আর শংকর। একটু চুপ করে থেকে জয় বলল, "তোর কিন্তু ওই কমলালেবুর খোসা ফেলে রাখার বুদ্ধিটা দারুণ হয়েছে টাবলুদা।"

"বুদ্ধিটা কিন্তু ধার করা," একটু থেমে থেমে উত্তর দিল টাবলু।

"ধার করা! কী রকম ?"

"রামায়ণ পড়িসনি ? ওই যে রাবণ যখন সীতাহরণ করেছিল তখন সীতা কী করেছিল ? গায়ের গয়নাগাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে ওই চিহ্ন দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারে সীতাকে কোন্‌-দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

টাবলুর ধার-করা বুদ্ধির কথা শুনে হেসে উঠল জয় আর শংকর। সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ধমক দিয়ে টাবলু বলল, "হাসিস না একদম, আমার কিন্তু ভীষণ মন খারাপ হয়ে আছে।"

"কেন ? কেন ?"

"তিব্বতী গুরু পেলাম, অথচ জাদু শেখা হল না।"

যা-সব ঘটনা ঘটে গেছে পরের পর, জয় আর শংকরের জাদু শেখার কথা মনেই ছিল না একদম। এখন মনে পড়াতে ওদের দুজনেরও মন খারাপ হয়ে গেল।

টাবলু খুব নিচু গলায় বলল, "এ-সব কথা কারুকে বলবি না। পরেরবার আমরা আবার গুরুর খোঁজে যাব। ব্ল্যাক আর্ট অব টিবেট শিখতেই হবে।"

জয় আর শংকর আরও নিচু গলায় বলল, "আচ্ছা।"

———